BANGLAPDF.NET

ইমদাদুল হক মিলন

অনেক কথা বলার ছিল

AKAS SUVOM

অনেক কথা বলার ছিল

ইমদাদুল হক মিলন

শিখা প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

অনেক কথা বলার ছিল

ইমদাদুল হক মিলন

অনেক কথা বলার ছিল

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু
ভ
ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

অনেক কথা বলার ছিল
ইমদাদুল হক মিলন

প্রকাশকাল ❑ বইমেলা ফেব্রুয়ারি ২০০০

স্বত্ব ❑ নির্বাচিতা হক/শুভেচ্ছা হক
প্রকাশক ❑ নজরুল ইসলাম বাহার শিখা প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
অক্ষরবিন্যাস ❑ কমপিউটার ল্যান্ড ৩৮/২-খ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ❑ সমর মজুমদার

মূল্য ❑ ৬০ টাকা

ANEK KATHA BALAR CHHILO (A novel) by Imdadul Haq Milon.
Published by : Nazrul Islam Bahar, Shikha Prokashoni, 38/4, Banglabazar, Dhaka
Computer Compose Computer Land 38/2-Kha, Banglabazar, Dhaka-1100
First Edtion Ekushe Boimela February 2000

Price Taka 60 only

ISBN 984-454-012-7

অনেক কথা বলার ছিল

ইমদাদুল হক মিলন

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা

(fb.com/groups/boiipoka)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

উৎসর্গ

সেই অসাধারণ অপরাহ্ন স্মরণে

ভেবেছিলাম এয়ারপোর্টে বসেই রাত কাটাতে হবে।

সাদি অবাক হল। কেন?

ব্যাগ সুটকেসের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে রুমি বলল, আটটার প্লেন এসে পৌঁছাল রাত একটায়।

তাতে কী হয়েছে? প্লেন তো ডিলে হতেই পারে!

হতে পারে না, নিয়মিতই হয়।

হাসিমুখে রুমির চোখের দিকে তাকাল সাদি। তোর কথাটা আমি বুঝেছি।

কী বলতো?

তুই ভেবেছিস এতরাত পর্যন্ত তোর জন্য এয়ারপোর্টে আমি ওয়েট করব না।

রুমি হাসল। দুরকমই ভেবেছি। করতে পারিস, নাও করতে পারিস।

আমি কিন্তু বদলাইনি।

এখন তো তাই দেখছি। কিন্তু যাওয়ার ব্যবস্থা কী রে? কোথায় যাব এতরাতে? এখন কি বাড়ি যাওয়া যাবে?

না।

তাহলে?

একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে রেখেছি। হোটেলে পৌঁছে দেবে।

হোটেল কোথায়?

শান্তিনগরের ওদিকটায়। আমার প্ল্যান ছিল আটটায় তুই এসে পৌঁছাবি, সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট করব। সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাব।

রুমি অবাক হল। এক দেড়ঘণ্টার মধ্যে কী করে পৌঁছাব?

পৌঁছানো যায়। একটু স্পিডে গেলে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি।

বলিস কী?

হ্যাঁ। মাওয়া পর্যন্ত অসাধারণ রাস্তা।

সে তো আমি যখন যাই তখন শুরু হয়েছিল।

হ্যাঁ এগারো বছর আগের কথা। এগারো বছর অনেক সময়।

তা অবশ্য ঠিক।

রাস্তা তো কমপ্লিট হয়েছেই, ধলেশ্বরীর ওপর দুটো ব্রিজও হয়েছে। বিক্রমপুর থেকে ঢাকায় এসে লোকে এখন নিয়মিত অফিস করে। যেমন আমি।

রুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সবকিছুই বদলায়। মানুষ, পৃথিবী।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভার উদগ্রিব হয়েছিল। সাদিকে দেখেই ছুটে এল। রুমিকে সালাম দিয়ে ট্রলি থেকে ব্যাগ সুটকেস নামিয়ে গাড়ির কেরিয়ারে তুলতে লাগল।

বাইরে থেকে রাত দুপুরের এয়ারপোর্ট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল রুমি।

সাদি তখন সিগ্রেট ধরিয়েছে।

রুমি বলল, তুই সিগ্রেট খাস?

হ্যাঁ।

কবে থেকে?

আট নবছর। মানে বিয়ের পর থেকে।

হঠাৎ ধরলি?

সিগ্রেট তো লোকে হঠাৎই ধরে।

রুমি হাসল। তা ঠিক। অনেক কিছুই হঠাৎ করে হয় লোকের। যেমন প্রেম।

সিগ্রেটে টান দিয়ে হাসল সাদি। তবে আমার সিগ্রেট ধরার অদ্ভুত একটা কারণ আছে।

কী কারণ?

গাড়িতে ওঠ, বলছি।

লাগেজ তোলা শেষ করে ড্রাইভার তখন সিটে বসেছে। ওরা দুজন ওঠার পর স্টার্ট দিল।

কিন্তু গাড়িতে উঠে সিগ্রেট প্রসঙ্গটা ভুলে গেল সাদি। বলল, আমি তো জানি তুই আসবি আটটায়। সোজা বাড়ি চলে যাব। সেভাবেই গাড়িটা ভাড়া করেছি। হঠাৎ দেখি প্লেন ডিলে হচ্ছে। কী করা যায়? গাড়ি নিয়ে সোজা দৌড়ালাম শান্তিনগরে, হোয়াইট হাউস হোটেল। ওই হোটেলের ম্যানেজার বদরুল আমার

পরিচিত। হোটেলের কথা ভাবতেই বদরুলের কথা মনে পড়েছিল, এজন্যই গেলাম ওখানে। ডাবল বেডের একটা রুম নিলাম। মানে হচ্ছে যত রাতেই আসিস তুই, তোকে নিয়ে এই হোটেলে এসে উঠব। হোটেলটার সুবিধে হল চব্বিশ ঘণ্টাই খাবার পাওয়া যায়।

কিন্তু ওদিকে খালা তো টেনশানে থাকবে?

তা থাকবে। কিছু করার নেই।

খবর দেবার ব্যবস্থা নেই?

না। তবে ভোরবেলা উঠেই রওনা দেব। গাড়ির সঙ্গেও পরে সেভাবেই কন্ট্রাক্ট হল। রাতেরবেলা ড্রাইভার গাড়িতেই থাকবে। গাড়িটা থাকবে হোটেলের সামনে। সকালবেলা চা খেয়ে বেরিয়ে যাব।

রুমি কথা বলল না। মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে হু হু করে আসছিল রাত দুপুরের হাওয়া। সেই হাওয়ায় আনমনা হচ্ছিল সে। কত কথা যে মনে পড়ছিল!

তখন যেন হঠাৎ করেই সিগ্রেট প্রসঙ্গটা মনে পড়ল সাদির। বলল, সিগ্রেট ধরার কারণটা শুনবি?

রুমি সাদির দিকে তাকাল না। বলল, বল।

কারণটা বউ।

এবার চট করে সাদির দিকে মুখ ফেরাল রুমি। মানে?

সাদি হাসল। বউর জন্য সিগ্রেট ধরেছি।

বলিস কী?

হ্যাঁ। বাসররাতেই বউ আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি সিগ্রেট খাও না? বললাম, না।

তার আগে তোর বউর নামটা বল।

সাদি অবাক হল। তুই জানিস না?

না।

কেন?

কী করে জানব?

তোকে চিঠিতে লিখেছিলাম। বিয়ের কার্ডও পাঠিয়েছিলাম, কার্ডে বর কনের নাম লেখা থাকে।

রুমি উদাস গলায় বলল, আমার মনে নেই।

এত ভুলো মন হয়েছে কেন তোর?

জানি না।

সবকিছুই কি ভুলে গেছিস?

না, সব কি আর ভোলা যায়!

তারপর হাসিমুখে রুমি বলল, বউর নামটা বল।

তিথি।

সুন্দর নাম।

এখন বল দেখতে কেমন?

রুমি আবার হাসল। দেখতে কেমন?

তুই দেখেছিস।

কোথায়?

জানতাম এই প্রশ্নটাও তুই করবি।

কেমন করে জানতি?

কারণ তুই ভুলে গেছিস।

তোর কথা আমি বুঝতে পারছি না।

আমি বলতে চাইছি আমার বউর নাম যেভাবে তুই ভুলেছিস, তার চেহারাও সেইভাবে ভুলেছিস।

চেহারা ভুলব কী রে, আমি তো তাকে দেখিই নি।

তাহলে চিঠিতে কি মিথ্যে কথা লিখেছিলি?

ফ্যাল ফ্যাল করে সাদির মুখের দিকে তাকাল রুমি। কোন চিঠিতে?

এবার শব্দ করে হাসল সাদি। বিদেশে থেকে থেকে তুই একেবারে গেছিস। বিয়ের পর তিথির আর আমার ছবি তোকে পাঠিয়েছিলাম। ছবি দেখে তুই লিখেছিলি আমার বউ দেখতে খুব সুন্দর।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

সত্যি আমার মনে নেই।

অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। আটবছর হয়ে গেছে। মনে নাও থাকতে পারে।

তার মানে তুই বিয়ে করেছিস আটবছর হয়ে গেল।

হ্যাঁ।

বাচ্চা হল কবে?

বিয়ের তিন বছর পর। আর...।

কথা শেষ না করে রহস্যময় হাসি হাসল সাদি।

রুমি বলল, আর?

আর একটা হব হব করছে। বউ বাপের বাড়ি গেছে বাচ্চা হওয়াতে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তোর শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

চিটাগাংয়ে। হাটহাজারি।

প্রথম বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে?

ছেলে।

দ্বিতীয়টা কী এসপেক্ট করছিস?

ছেলে।

কী?

ছেলে।

কেন?

আমি ছেলে পছন্দ করি।

তোর বউ?

সেও।

ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত।

হ্যাঁ, সাধারণত একটা ছেলে একটা মেয়ে চায় সবাই। আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো।

তাই তো দেখছি।

একটু থেমে রুমি বলল, ছেলের নাম কী রেখেছিস?

অন্তু।

পরেরটা যদি ছেলেই হয় কী রাখবি?

ছেলেই হবে?

কী করে বুঝলি?

তিথি বলেছে।

সে কী করে বলল? কী কী সব করে বাচ্চা ছেলে না মেয়ে আগেভাগেই নাকি আজকাল জানা যায়, তোর বউ কি ওসব করেছে?

না। মেয়েরা বোধহয় বুঝতে পারে। বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরার দিন আমাকে বলল, ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো, ছেলে রেডি থাকবে। সিমটমে বোঝা যাচ্ছে এবারও আর একটি অন্তু হবে।

ভালই। কিন্তু নাম কী রাখবি?

তা অবশ্য ভাবিনি।

তারপর দুজনেই চুপচাপ হয়ে গেল। কিছুটা সময় কাটল নিঃশব্দে।

হঠাৎ রুমি বলল, তোরও বেশ ভুলোমন, সাদি।

সাদি অবাক হল। কী রকম?

গাড়িতে উঠেই একটা কথা বলতে চেয়েছিলি তুই। বলিসনি।

কী কথা বল তো?

আমি বলব কেন! তুই ভেবে বের কর।

মনে করতে পারছি না।

সিগ্রেট ধরার কথা।

সিগ্রেট ধরার কথা বললাম না, যে বউর জন্য ধরেছি।

পুরোটা বলিসনি। শুধু বললি বাসররাতে বউ জিজ্ঞেস করেছিল...।

হ্যাঁ।

পরের অংশটা বল।

বলা উচিত, ওটাই বেশি ইন্টারেস্টিং। আমি যখন বললাম, না আমি খাই না, অভ্যেস নেই, শুনে সে একটু মন খারাপ করল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বলল, সিগ্রেট না খেলে পুরুষমানুষকে মানায় নাকি! সিগ্রেট খেলে খুব ম্যানলি লাগে। আর আমি খুব পছন্দ করি।

বেশ মডার্ণ মেয়ে রে!

তারপরেরটা শোন।

বলে গলা নামাল সাদি। ড্রাইভার শুনে ফেলতে পারে, এজন্যই নিচু গলায় বলতে হচ্ছে।

রুমি বলল, তাহলে এখন বলবার দরকার নেই। হোটেলে গিয়ে বলিস।

সাদি খুশি হল। তাই ভাল। তাছাড়া হোটেলের কাছে তো এসেই গেছি।

আর কতক্ষণ লাগবে?

মিনিট তিন চারেক।

রাতের রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। বাস্তবিকই তিন চার মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে গেল ওরা।

রুমে ঢুকেই সাদি বলল, কী খাবি? ভাত?

রুমি বলল, আমি আসলে কিছুই খেতে চাচ্ছি না।

কেন?

প্লেনে খাবার দিয়েছিল।

কখন?

আটটার দিকে।

তার মানে প্রায় ছয়ঘণ্টা আগে। এর মধ্যে তো খিদে লেগে যাওয়ার কথা।

আমার লাগেনি। তুই খা।

আমি খাব না।

কেন?

এই হোটেলে রুম ঠিকঠাক করে যাওয়ার সময় এখান থেকেই রাতের ভাত খেয়ে গিয়েছিলাম। এই হোটেলের খাবার চমৎকার।

তার মানে তুই অর্ডার দিতে চাচ্ছিস আমার জন্য?

হ্যাঁ।

দরকার নেই।

সাদি যেন হাঁপ ছাড়ল। তাহলে তো কোনও ঝামেলাই নেই। বাথরুমে ঢুকে যা। জামা কাপড় ছেড়ে ফ্রেস হ।

কিন্তু তুই কী পরে ঘুমাবি?

এই যা পরে আছি। আমি তো বুঝতে পারিনি এই অবস্থা হবে। তাহলে একটা ব্যাগে করে লুঙ্গিটুঙ্গি নিয়ে আসতাম।

দাঁড়া আমি ব্যবস্থা করছি।

দুটো সুটকেসের অপেক্ষাকৃত বড়টা খুলল রুমি। আনকোড়া দুসেট স্লিপিং ড্রেস বের করল। একটা ঘি রংয়ের আর একটা হালকা আকাশি। সাদির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, যেটা তোর পছন্দ নে।

ঘি রংয়েরটা ধরল সাদি। এটাই নিই।

পছন্দ হলে নে।

দুটোই পছন্দ। তবু এটা নিচ্ছি।

কেন?

আকাশি রংটা তোর একটু বেশি পছন্দ। তুই সব সময় এই রংটা পছন্দ করিস। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি।

রুমি কথা বলল না।

সাদি বলল, এখনও পছন্দ তেমন আছে না বদলেছে?

আছে। এটা বদলায়নি।

তারপর সাদিকে তাড়া দিল রুমি। তুই আগে বাথরুমে ঢোক, আমার সময় লাগবে।

কেন?

গোসল করব।

এতরাতে?

অসুবিধা নেই। আমি ড্রাইভার মানুষ। যখন তখন গোসল করতে পারি, যখন তখন ঘুমোতে পারি। কোনও কিছুতেই কোনও অসুবিধা হয় না।

ড্রাইভার মানুষ মানে?

গাড়ি চালাই না?

কী গাড়ি?

ইয়েলো ক্যাব। ভাড়ার গাড়ি। আমেরিকায় আমার পেশা হচ্ছে ড্রাইভারী।

ওসব দেশে সবকিছুই করা যায়। টাকা আছে তো! টাকা পেলে কাজ করতে অসুবিধা কী!

তা ঠিক। যা যা বাথরুমে ঢোক।

স্লিপিংড্রেস হাতে বাথরুমে ঢুকে গেল সাদি।

রাতটা গল্প করেই কাটল।

বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে ঘি রংয়ের স্লিপিংড্রেস পরে সাদি বেরিয়ে আসার পর রুমি গিয়ে ঢুকল। মিনিট দশেক লাগল তার গোসল করে বেরুতে। বিশাল লম্বা জার্নির পর এরকম একটা আরামদায়ক গোসল, রুমি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল।

বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে সাদি তখন সিগ্রেট টানছে।

দেখে রুমি বলল, এখন তোর বউ আর সিগ্রেটের গল্পটা বল।

সাদি হাসল। হ্যাঁ এখন বলা যায়। এখনই আসল সময়।

আসল সময় মানে?

মানে গল্প বলার পারফেক্ট টাইম।

রুমি তার বিছানয় বসল।

সাদি বলল, বাসররাত থেকে শুরু করি।

যেখান থেকে ইচ্ছে কর।

প্রথমে তো সিগ্রেট খাই কি না জানতে টানতে চাইল। তারপর বলল, বাসররাত নিয়ে সবসময় একটা স্বপ্ন ছিল আমার।

তা সব মেয়েরই থাকে।

না ওরকম স্বপ্ন নয়।

তাহলে কেমন?

একেবারেই অন্যরকম।

রুমি হাসল। শুনি।

তিথির নাকি স্বপ্ন ছিল সে বউ সেজে বসে আছে বাসরঘরের খাটে, এই ঘরে ঢুকেই প্রথমে দরজাটা বন্ধ করবে বর, তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে, সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে টানতে তার পাশে এসে বসবে। আমি তা না

করতেই তার স্বপ্নটা ভেঙে গেল এবং সিগ্রেট নিয়ে প্রশ্নটা আমাকে করল। সিগ্রেট প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি ক্রমশঃ তার দিকে এগুচ্ছি। প্রথমে হাত ধরলাম।

তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করি।

কর।

আগে থেকেই কি তিথির সঙ্গে তোর পরিচয় ছিল?

মানে বিয়ের আগে?

হ্যাঁ।

না। বাসররাতের আগে ওকে আমি জ্যান্ত দেখিইনি।

জ্যান্ত দেখা মানে?

সাদি হাসল। তারপর সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে এসট্রেতে গুঁজে রাখল। মানে ছবি দেখেছি, বাস্তবে দেখিনি।

অদ্ভুত ব্যাপার!

কেন, অদ্ভুত ব্যাপার কেন?

কখনই দেখিসনি এরকম একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেললি!

এরকম তো অনেকেই করে।

আজকাল করে না, আগের দিনে করত।

কোথাও কোথাও এখনও করে।

তা যে করে তার প্রমাণ তুই।

সাদি আবার হাসল। তারপরের ঘটনা শোন। হাত ধরার পর সিনেমার মতো করে চিবুক ধরে তিথিকে দেখলাম। সুন্দর মেয়ে। বেশ সুন্দর। চোখ, চেহারা এট্রাকটিভ। ফিগার খুবই সুন্দর। চট করে দেখেই যে কেউ তিথিকে পছন্দ করবে। ছবিতে দেখে যতটা না ভাল তিথিকে আমার লেগেছে, বাস্তবে দেখে আমি একেবারেই মুগ্ধ। চুমু খেতে গেছি, চট করে মুখ সরিয়ে নিল তিথি। ভাবলাম প্রথম প্রথম এমনই করে মেয়েরা। তারপর আবার এটেম্পট নিলাম। একই ঘটনা ঘটল।

তার মানে চুমু খেতে দেবে না?

না। আমি জোরাজোরি করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে বলল, আজ হবে না। যত চেষ্টাই কর, হবে না। আমি বিব্রত। কেন হবে না। কবে হবে? বলল, কাল হতে পারে। তবে আমার একটা শর্ত আছে। কাল থেকে সিগ্রেট খেতে হবে তোমাকে। সিগ্রেট না খেলে চুমু খেতে আমি দেব না। পুরুষমানুষের মুখে

সিগ্রেটের গন্ধ না থাকলে মেয়ে মেয়ে মনে হয়। মনে হয় মেয়েতে মেয়েতে চুমু খাচ্ছে।

ঠিক এভাবেই তোকে বলল?

হ্যাঁ। তিথি খুব পরিষ্কার ধরনের মেয়ে। স্পষ্ট কথা বলে। রাখ ঢাক কম।

তো ওর কথামতো পরদিন তুই সিগ্রেট ধরলি?

ধরলাম। সত্যি ধরে ফেললাম। কী করব, বউকে চুমু না খেয়ে কতদিন থাকব! বউ বাড়িতে রেখে মাওয়ার বাজারে গেলাম। তিন প্যাকেট বেনসন সিগ্রেট কিনলাম। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতো। ধোঁয়া গিললে কাশি হতো। আস্তেধীরে ঠিক হয়ে গেল।

হ্যাঁ, খারাপ জিনিস দ্রুত ধরা যায়।

তুই তো সিগ্রেট ধরিসনি, না?

না।

মদ?

না, তেমন করে না। দুচার বার খেয়েছি। হুইস্কি রাম ভদকা ব্রান্ডি, নানা রকমের ওয়াইন, বিয়ার। সবই টেস্ট করে দেখেছি। ধরিনি।

তবে যে শুনি বিদেশে ওসব না ধরে থাকা যায় না?

বাজে কথা। আমার মতো প্রচুর ছেলে আছে যারা ওসবের ধারে কাছেও নেই। কাজ করে, বাসায় এসে রান্না করে খায়, ঘুমোয়।

কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষের ধারণা ইউরোপ আমেরিকাতে থাকা ছেলেরা মদ মেয়েমানুষে একেবারেই ডুবে যায়।

অতিবাজে এবং ভুল ধারণা। যাহোক, তোর বউর কথা বল।

হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে হলো, সেটা আগে বলি। আমরা দুজন ভাই। খালাতো ভাই। আমি তোর চে' মাস চারেকের বড়। খালাতো ভাই হলেও সম্পর্কটা আমাদের আপন ভাইর মতো। তোর জন্মের সময় খালা মারা গেল, তুই গেলি বেঁচে। খালা আর মা ছিল পিঠোপিঠি। মা বড়। মার কোলে চারমাসের আমি। আপার বয়স তখন আড়াই বছর। এই অবস্থায় ছোটবোনের ছেলে তোকেও বুকে তুলে নিলেন মা। এক মায়ের গর্ভে আমরা জন্মাইনি ঠিকই কিন্তু একই মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। সেই অর্থে আমরা দুজন আপন ভাইই।

রুমি হাসিমুখে বলল, তাতো বটেই। কিন্তু কী কারণে কথাগুলো এখন বললি?

এরকম দুটোভাই রাত দুপুরে নির্জন হোটেলে বসে, বড়ভাইটি নিজের স্ত্রীকে কেমন করে প্রথম চুমু খেল সেই ঘটনা বলছে। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং না?

রুমি শব্দ করে হাসল। তা ঠিক। তবে ভাই হলেও আমরা দুজন খুব ভাল বন্ধুও।

রাইট। এটাই হচ্ছে আসল কথা।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলেবেলার মতো করে রুমি বলল, তো বন্ধু, চুমুর ঘটনাটা বলে ফেল।

বলছি। কিন্তু আর একটা শর্ত আছে। চুমু পরবর্তী ঘটনা জানতে চাইবি না।

এ কথায় হেসে ফেলার কথা রুমির। কিন্তু সে হাসল না। কী রকম আনমনা গলায় বলল, আরে না। ওসব কেউ জানতে চায়?

চায়। অনেকেই চায়। অনেকে নিজ থেকেই বন্ধুদেরকে বলে।

তা বলে কিন্তু তোর বলার দরকার নেই।

ঠিক আছে।

বিছানায় আধশোয়া হল সাদি। নিজের অজান্তে রুমিও তাই করল।

সাদি বলল, আমাকে সিগ্রেট খেতে দেখে কী যে খুশি হল তিথি। নানারকমভাবে তার উচ্ছ্বাস আনন্দের কথা প্রকাশ করতে লাগল। ভঙ্গিটা একেবারে শিশুর মতো। যেন জীবনের সবচে আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি অতি সহজে পেয়ে গেছে সে। গভীর আবেগে আমার একটা হাত দুহাতে চেপে ধরে বলল, তুমি খুব ভাল। আমি যা চেয়েছি তাই করেছ। সারাজীবন ধরে তোমার জন্যও আমি সব করব। তুমি দেখো।

সাদির মুখের দিকে তাকাল রুমি। ঠাট্টার গলায় বলল, বউ তো স্বামীর জন্য করবেই। এ আর নতুন কী! তারপর কী করলি নতুন বউর সঙ্গে সেটা বল। কীভাবে কী হল, খুলে বল। লুকোবার দরকার নেই।

সাদি হাসল। তোর আমার জীবনের কোনও কিছু কি লুকোনো আছে?

রুমি মনে মনে বলল, আছে। বিশাল এক ঘটনা লুকোনো আছে। আমি তোকে বলিনি।

মুখে বলল, তা ঠিক।

সাদি বলল, কিন্তু তিথিকে নিয়ে আমার মনে তখন অন্য এক প্রশ্ন। প্রশ্ন না বলে সন্দেহ বলতে পারিস।

রুমি অবাক হল। কিসের সন্দেহ?

স্ত্রী কিংবা প্রেমিকাকে পুরুষমানুষরা যে রকম সন্দেহ সাধারণত করে। ঠাট্টার

ছলে সন্দেহটা আমি প্রকাশ করলাম। অর্থাৎ কায়দা করে কথা বের করবার চেষ্টা।

মানে সিগ্রেটের গন্ধ তিথি পছন্দ করে বলে সন্দেহটা তোর হয়েছে।

রাইট। আমার মনে হয়েছে নিশ্চয় তিথির সঙ্গে কারও প্রেমট্রেম ছিল। শুধু প্রেম নয়, চুমু খাওয়া খাওয়ি বা তারচেও বেশি কিছু। সেই ছেলেটি হয়তো সিগ্রেট খেত। নিশ্চয় তার আদল আমার মধ্যে খুঁজছে তিথি। এজন্যই সিগ্রেট নিয়ে অতকথা বলেছে।

এটা অবশ্য হতে পারে। বেশিরভাগ পুরুষমানুষেরই এমন হয়।

মেয়েদের হয় না?

হবে না কেন? তাদেরও হয়।

তাদের হয় পুরুষদের চে' বেশি।

এটা বোধহয় ঠিক নয়। মেয়েদের তুলনায় পুরুষরা বেশি সন্দেহপ্রবণ।

কী জানি।

ঠিক আছে, যা বলতে চাইছিলি বল।

বিষয়গুলো নিয়ে যেভাবে কথা হয়েছিল তিথির সঙ্গে হুবহু সেভাবে বলাটা কঠিন। দুজন মানুষের চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে হবে।

পারলে কর।

সাদি হাসল। ঠিক আছে, করছি। শুরু হল এইভাবে, আমি বললাম, তুমি কি গার্লসস্কুলে পড়তে?

তিথি বলল, মেয়েরা গার্লসস্কুলে পড়বে না তো কোথায় পড়বে?

না, কোএডুকেশান স্কুলেও পড়ে অনেকে।

আমি পড়িনি। যে স্কুলটায় পড়তাম সেটা গার্লসস্কুল এবং কলেজ। কলেজেও আমি ওখানেই পড়েছি। ক্লাশ ওয়ানে ঢুকেছি, ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বেরিয়েছি।

বিএ পড়েছ কোথায়?

সেটা একটা কোএডুকেশন কলেজ। কিন্তু পরীক্ষা দেয়া হল না।

কেন?

তোমার জন্য।

আমি কী করেছি?

এই যে বিয়ে করে ফেললে।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, প্রথমে বিয়ে তারপর বিএ।

না বাবা, এখন আর পড়তে আমার ভাল লাগবে না। এখন আমি একটা কাজই করব। তোমার সঙ্গে প্রেম।

তোমার মানসিকতা দেখছি পুরনো দিনের মেয়েদের মতো।

কী রকম?

এদেশের, মানে এই সাবকন্টিনেন্টের আগের দিনের মেয়েরা যৌবনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবত কবে তাদের বিয়ে হবে, কবে স্বামীর সঙ্গে প্রেম করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তোমার কথাটা ঠিক নয়। সব কন্টিনেন্টেই মেয়ে এবং পুরুষরা চিরকালই একরকম। কারও কোনও চেঞ্জ নেই।

কথাটা বুঝতে পারলাম না।

বিয়ের আগেও নারী পুরুষরা চিরকাল প্রেম করেছে, বিয়ের পরও করেছে। এখনও করছে। তবে আজকালকার দিনে ছেলে মেয়েরা প্রেম করলেই বিয়ে করতে চায়।

এটা আজকালকার দিনে কেন, সবদিনেই হয়েছে। যাকে ভালবাসবে তাকে বিয়ে করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

কেউ কেউ আবার চায়ও না। প্রেমিককে আলাদা রাখতে চায়, স্বামীকে আলাদা।

তারা একটু উচ্চমার্গিয়।

কিছু উচ্চমার্গিয় লোক তো থাকেই। কোনও কোনও মেয়েও আছে যারা এরকম।

তুমি কী রকম?

কথা শুরু করার পরই বুঝেছিলাম কী উদ্দেশে এগুচ্ছ তুমি। এবং এতক্ষণ কথা বলার পর, মাথায় যদি ঘিলু থেকে থাকে তাহলে বুঝে গেছ আমি মোটেই পুতুপুতু ধরনের মেয়ে নই। খুবই পরিষ্কার কথার মানুষ, রাখ রাখ, ঢাক ঢাক কম।

তা আমি বুঝেছি।

যা জানতে চাও স্পষ্ট করে বল।

সাহস পাচ্ছি না।

কেন?

তুমি রাগ করতে পার।

কথা দিচ্ছি, রাগ করব না।

সত্যকথা বলবে?

বলব, তবে আমার একটা শর্ত আছে। তোমাকেও সত্যকথা বলতে হবে।

সাদি থামল। তোর বোর লাগছে না তো?

চিৎ হয়ে শুয়েছিল রুমি। সাদির কথা শুনে কাত হল। না, ভালই লাগছে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে।

সাদি আবার সিগ্রেট ধরাল। ছেলেবেলার কোন কথা?

তুই আর আমি দোতলায় শুতাম। সহজে ঘুম আসতো না আমাদের। অনেকরাত পর্যন্ত জেগে তুই আমাকে কিচ্ছা শোনাতি। কিচ্ছা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম আমি।

আর আমি তা টেরই পেতাম না। বলে যাচ্ছি তো বলেই যাচ্ছি। এক সময় টের পেতাম তোর শ্বাসপ্রশ্বাস ভারি হয়ে পড়ছে।

আজ তেমন হয়নি তো?

হয়েছে কিন্তু।

তাই নাকি!

সে এজন্যই বোর লাগার কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। দেখতে চাইলাম তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস কী না।

না রে, ছেলেবেলার দিন আর আজকের দিন এক নয়। জীবন একেবারেই বদলে গেছে। আজ রাতে ঘুম আর আসবেই না।

আমারও তাই মনে হয়। চল গল্প করে কাটিয়ে দিই। সাতটার দিকে বেরিয়ে যাব।

এত দেরি করে কেন? ছটার দিকে যাই।

অসুবিধা নেই।

ঠিক আছে কিচ্ছাটা আবার শুরু কর।

সিগ্রেট টান দিয়ে সাদি বলল, ভালই বলেছিস। কিচ্ছা। আসলে কিচ্ছাই। মানুষের জীবন কিচ্ছায় ভর্তি। ছোট বড় কত কিচ্ছা!

রুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেমন আমার। জন্মালাম একমায়ের গর্ভে, মানুষ হলাম অন্যমায়ের কোলে। কত স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছি এক দেশে, এখন জীবন কাটাতে হচ্ছে আরেক দেশে। কত মানুষ, কত প্রিয়জন ছিল একসময় চারপাশে, এখন কেউ নেই।

রুমিকে থামাল সাদি। এসব কথা পরে হবে। তোর কাছ থেকে অনেক কিছু শোনার আছে আমার। তোরটা পরে শুনব। আগে আমারটা শেষ করি।

আমার কিন্তু কিচ্ছা একটাই। তিথি, আমার বউ।

আমাকে এসব বোঝাবার দরকার নেই। আমি সবই জানি। কেন, পুতুলের কিচ্ছাটা কী হল?

সে তো ছেলেবেলার কথা। আমি আই এ পড়ি, পুতুল পড়ে নাইনে। তিথির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে পুতুলও আসবে। শোন না।

সাদি আবার শুরু করল। সত্যকথা বলতে হবে শুনে আমি নির্দ্বিধায় বললাম, বলব।

প্রমিজ?

প্রমিজ।

তাহলে কে আগে বলবে?

তুমি।

ঠিক আছে। আমি বুঝেছি তুমি কী জানতে চাইছ। তবু প্রশ্ন কর।

আবার বলছি, তুমি রাগ করবে না তো!

না। কারণ আমি বিশ্বাস করি তোমার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাব আমি। সুতরাং তোমার কাছে জীবনের কোনও কিছুই লুকিয়ে রাখতে চাই না, গোপন রাখতে চাই না।

শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমিও তোমার কাছে কোনও কিছু লুকোব না।

তবে সব কথা খুলে বলার কিছু বিপদও আছে। কেউ কেউ ভুল বোঝে। খারাপ মনে করে। এসো, আমরা প্রমিজ করি, আমরা কেউ তা করব না।

প্রমিজ করলাম।

এবার প্রশ্ন কর?

তোমার কি কারও সঙ্গে প্রেম ছিল? কাউকে ভালবেসেছিলে তুমি?

একথার জবাব দেয়ার আগে তিথি বলল, আর একটা কথা, আমাদের দুজনের কথা দুজনকেই গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করতে পারবে না। কোনও অবস্থাতেই না।

ঠিক আছে।

আমিও তোমার সবকথা বিশ্বাস করব।

প্রশ্নের উত্তর দাও।

না আমার কারও সঙ্গে প্রেম ছিল না। ভাল কাউকে আমি বাসিনি। যদি কারও সঙ্গে আমার প্রেম থাকত কিংবা সত্যি আমি কাউকে ভালবাসতাম তবে যেমন করেই হোক তাকেই আমি বিয়ে করতাম। গার্জিয়ানরা রাজি না হলে

পালিয়ে করতাম। ভালবাসার মানুষকে ছাড়া জীবন আমি কাটাতাম না। তার জন্য দরকার হলে জীবন দিয়ে দিতাম। কিন্তু ভাল একজনকে আমার লেগেছিল।

তাই নাকি? কে সে?

আমার মেজোভাইয়ের বন্ধু। মাসুদ নাম।

কী করতো সে?

মেজোভাইর সঙ্গে পড়ত। একটু আধটু গান গাইতো। হেমন্ত ছিল তার প্রিয় শিল্পী। একটা গান খুব ভাল গাইতো।

আমিও পথের মতো হারিয়ে যাব
আমিও নদীর মতো
আসবো না ফিরে আর
আসবো না ফিরে কোনওদিন।

একদিন মেজোভাইর সঙ্গে আমাদের ছাদে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। আড্ডা দিতে দিতে রাত। হঠাৎ গলা ছেড়ে গানটা সে গাইতে শুরু করল। নিচ থেকে সেই গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই প্রথম তাকে আমার ভাল লাগল।

রুমির দিকে তাকাল সাদি। তিথির মুখে ওই গানটার কথা শুনে এমন লাগল আমার, কী বলব তোকে! আমার সমস্ত শরীর কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। অপলক চোখে তিথির মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম।

তিথি বলল, কী হল? এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?

একটা খুব কাকতালীয় ব্যাপার ঘটল। বললে তোমার খুবই অবিশ্বাস্য মনে হবে।

তবু বল।

এই গানটা আমারও খুব প্রিয়। আমিও গাইতে পারি। বহুদিন আগে একরাতে এই গানটা আমিও একজনের জন্য গেয়েছিলাম। সেটা ছিল এক আশ্চর্য সুন্দর রাত। অসাধারণ এক ঘটনা ঘটেছিল সেই রাতে।

সঙ্গে সঙ্গে তিথি আমাকে থামাল। এখন বলো না। তোমার কথা আমি পরে শুনব। আগে আমারটা শোন।

ঠিক আছে, বল।

পরদিন বিকেলে মাসুদ ভাই আবার এল আমাদের বাড়িতে। মেজোভাইর রুমের দিকে যাচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা, বললাম, কালরাতে আপনার গাওয়া গানটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আগে আমি খেয়াল করিনি, মাসুদ ভাই তার একটা হাত পেছন দিকে রেখেছিল, আমার কথা শুনে চারদিক সাবধানী চোখে

দেখে হাতটা বের করে আনল। দেখি তার হাতে সিগ্রেট। আমার মা বাবা বড়ভাই কিংবা মুরব্বিস্থানীয় কেউ দেখে ফেলে কী না এজন্য জ্বলন্ত সিগ্রেট লুকিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছিল সে। এখন আমার কথা শুনে এবং কাছে পিঠে মুরব্বি ধরনের কাউকে না দেখে সিগ্রেট ধরা হাতটা সে সামনে আনল এবং বেশ বড় করে সিগ্রেটে একটা টান দিল। কী বলব তোমাকে, সেই ভঙ্গিটা কী যে ভাল লাগল আমার! মনে হল এই মুহূর্তের আগে মাসুদের মতো সুপুরুষ আমি আর কখনও দেখিনি। তাকে আমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মনে হল। আর সিগ্রেটের গন্ধটা যে কী ভাল লাগল! মনে হল সুপুরুষ মানেই সিগ্রেট। সিগ্রেট না খেলে পুরুষ হয় কী করে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তখন কত বড়?

এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। তখনও রেজাল্ট হয়নি। সতের বছর বয়েস।

তারপর কী হল?

আমি মুগ্ধ হয়ে মাসুদের সিগ্রেট ধরা হাত এবং মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, সে আমাকে বলে কী, আমি গানটা কেন গেয়েছিলাম জানো! তোমার জন্য। শুনে আমি হতভম্ব। আমার জন্য কেন? জানি না। বলে সিগ্রেট টানতে টানতে মেজোভাইয়ের রুমের দিকে চলে গেল সে। সেই রাতে আমার সহজে ঘুম এল না। প্রায় সারারাতই মাসুদের কথা ভাবলাম আমি। কেন আমার জন্য ওই গানটা সে গেয়েছিল? দুতিনদিন পর আবার আমাদের বাড়িতে এল সে। সুযোগ পেয়ে আমি তাকে ধরলাম। আমার জন্য গানটা আপনি কেন গেয়েছিলেন বলতে হবে। মাসুদ বলল, এখানে বলব না। অন্য কোথাও আমার সঙ্গে তুমি যদি দেখা কর তাহলে বলব।

তার মানে তোমাকে নির্জনে পাওয়ার চেষ্টা?

হ্যাঁ। পরিষ্কার অফার।

গেলে তুমি?

গিয়েছিলাম।

কোথায়?

কাছাকাছিই ওর এক বন্ধুর বাড়িতে। দুদিন পর। ওর বন্ধুর নাম বিলু। বিলুর রুমটা ছিল রাস্তার ধারে। রাস্তার দিককার দরজা দিয়ে যে কেউ ওই ঘরে যেতে পারে, ভেতর বাড়ি থেকে কেউ দেখতে পাবে না। মাসুদ গিয়ে আগেই ওই ঘরে বসেছিল। আমি যাওয়ার পর বিলু বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ আগেই বিলুর সঙ্গে মাসুদের কথা হয়েছে। আমাকে নির্জনে পাওয়ার ব্যবস্থাটা সে করে

রেখেছে। বিলু বেরিয়ে যাওয়ার পরই দরজাটা সে বন্ধ করল। কিন্তু আমি একদমই ভয় পেলাম না। কারণ আমি তখন মুগ্ধ হয়ে মাসুদকে দেখছি। হাতে সিগ্রেট থাকায় কী যে অসাধারণ লাগছে ওকে। প্রথম দিনের মতোই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনে হচ্ছে তাকে। যাহোক একসময় মাসুদ এসে আমার পাশে বসল। বসে সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে পায়ের সামনে ফেলে স্যান্ডেল দিয়ে পিষে দিল। ওর নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুল। এই দৃশ্যটাও আমাকে মুগ্ধ করল। বোধহয় আমার মুগ্ধতা ভালই বুঝতে পেরেছিল মাসুদ। আমার একটা হাত ধরল সে। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে তিথি। তোমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই সেইরাতে গান গেয়েছি আমি। প্রায়ই তোমাদের বাড়ি যাই তোমার জন্য। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব। বলেই মুখটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এল মাসুদ। আমাকে চুমু খেতে চাইল।

আমার বউকে একদিন চুমু খেতে চেয়েছে একজন, মুখের সামনে নিয়ে এসেছে মুখ শুনে আমি একেবারে হাহাকার করে উঠলাম। তুমি ওকে চুমু খেতে দিলে?

তিথি আমাকে থামাল। চুমু খেতে দিলাম কী দিলাম না বলছি তো! শোন না! ওর মুখ থেকে সিগ্রেটের আশ্চর্য গন্ধটা এসে আমার নাকে লাগল। নিজের কাছে নিজে আমি কী রকম অচেনা হয়ে গেলাম। মাসুদ যে চুমু খাওয়ার জন্য আমার মুখের কাছে এনেছে নিজের মুখ আমি যেন বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ঠিক সেই মুহূর্তে বিলু এসে দরজায় ধাক্কা দিল। মাসুদ, দরজা খোল। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেল মাসুদ। আমি যেন স্বপ্নের এক জগত থেকে ফিরে এলাম।

শুনে হাঁপ ছাড়লাম আমি। অর্থাৎ মাসুদ তোমাকে চুমু খেতে পারল না?

না। এসবের ঠিক তিনদিন পর চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলাকায় খুন হল মাসুদ।

শুনে থতমত খেলাম আমি। কী?

হ্যাঁ, খুন হল। মাসুদের একটা মাস্তান বাহিনী ছিল। অন্য এক বাহিনীর সঙ্গে মারামারি লেগেছিল তাদের। মাসুদকে একটার পর একটা ছুরি মেরে খোলা রাস্তায় শেষ করে ফেলল শত্রুপক্ষ।

শুনে আমি বললাম, দুঃখজনক ঘটনা। মাসুদের মৃত্যুতে নিশ্চয় তুমি খুব দুঃখ পেয়েছিলে?

ঠিক দুঃখ কী না জানি না, আমার মনটা কী রকম যেন হয়ে গিয়েছিল।

প্রায়ই ওর কথা আমার মনে পড়ত। আশ্চর্য ব্যাপার যখনই মনে পড়ত সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে যেন সিগ্রেটের আশ্চর্য একটা গন্ধ ভেসে আসত আমার নাকে। সেই গন্ধে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মাসুদের কথা কখনও কাউকে বলিনি আমি, আজ প্রথম তোমাকে বললাম। মাসুদকে ওইটুকু দেখেই আমি পুরুষমানুষ বুঝতে শিখেছিলাম। পুরুষমানুষের সঙ্গে কোথায় যেন কী একটা গন্ধ, বোধহয় সিগ্রেটেরই নাকি ঘামের, অর্থাৎ একটা গন্ধের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি তারপর থেকে ভেবেছি আমার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে যেন মাসুদের মতো হয়। সে যেন সিগ্রেট খায়। তার সঙ্গে যেন থাকে একটা পুরুষ গন্ধ। বুনোভাব।

শুনে গম্ভীর গলায় আমি বললাম, অর্থাৎ স্বামীর মধ্যে মাসুদকে খোঁজা?

হতে পারে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে মাসুদ বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে তোমার প্রেম হতে পারত, বিয়ে হতে পারত?

পারত।

ওরকম একটা মাস্তানকে তুমি বিয়ে করতে?

প্রথমে ভালবেসে তার মাস্তানি ছাড়াতাম তারপর করতাম।

আমি হাসলাম। এই তোমার গল্প?

গল্প নয়, ঘটনা। সত্য ঘটনা।

খানিক চুপ করে রইল তিথি, তারপর বলল, এবার তোমারটা বল।

সাদি রুমির দিকে তাকাল। কী রে, কী বুঝলি?

রুমি বলল, একটা কথা বেশ ভালই বুঝেছি, তিথি খুবই অন্য ধরনের মেয়ে। সাহস এবং সততা দুটোই তার আছে। জীবনের এই ধরনের গল্প মেয়েরা সাধারণত প্রেমিক কিংবা স্বামীকে বলতে চায় না। ভাবে কেউ বিশ্বাস করবে না। ভুলও বুঝতে পারে।

এতে ভুল বোঝার কী আছে?

জানতাম এই প্রশ্নটাও তুই করবি। কারণ তুইও খুব পরিষ্কার মনের মানুষ। তিথির সিগ্রেট পছন্দ করার কথা শুনে সন্দেহ তোর মনে একটা দেখা দিয়েছিল ঠিকই, ওর কথা শুনে তোর মন থেকে তা মুছেও যাওয়ার কথা।

তা গেছে। আমি খুব সরল বিশ্বাসী মানুষ। সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করি।

এটা ভাল। এই ধরনের মানুষদের জীবনে জটিলতা কম থাকে। তারা খুব সুখি হয়।

আমিও সুখেই আছি। তিথিকে নিয়ে সত্যি খুব সুখে আছি আমি। ইদানিং

একটু অর্থকষ্টে আছি ঠিকই কিন্তু তারপরও আমি খুব সুখি।

সাদি অর্থকষ্টে আছে শুনে রুমি হকচকিয়ে গেল। তুই অর্থকষ্টে আছিস মানে? কী হয়েছে তোর? আমাকে জানাসনি কেন?

সাদি বিছানায় উঠে বসল। এজন্যই জানাইনি। তুই একসাইটেড হয়ে যাবি।

কিন্তু কী হয়েছে আমাকে বল।

তেমন কিছুই হয়নি। তারপরও আমি তোকে সবই বলব। অস্থির হওয়ার কিছু নেই। সময় আছে। তারচে' বউর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা শেষ করি। আমার জীবনের সবকথা তুই জানিস, শুধু বিয়ে পরবর্তী জীবনের কথা জানিস না। আর একটা ব্যাপার সামান্যই জানিস, সেটাও আজ পুরোপুরি বলব। তিথিকে যেভাবে বলেছিলাম।

রুমি ঘড়ি দেখল। চারটা চল্লিশ বাজে।

সে একটা হাই তুলল।

সাদি বলল, ঘুম পাচ্ছে নাকি রে?

না। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন আর কিসের ঘুম। বল।

কার কথা বলতে চাই, বল তো?

পুতুলের! তুই কি ভেবেছিস এটা আমি বুঝব না?

না বোঝার অবশ্য কিছু নেই। পুতুল সম্পর্কে তুই কিছুটা জানিস।

ওই একটা জায়গায়ই একবার, মাত্র একবার আমাকে ছাড়া গিয়েছিলি তুই। চার পাঁচদিন ছিলি। আমরা দুজনেই তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

গিয়েছিলাম পুতুলের জন্য। ঘটনাটা সেবারেরই। বর্ষাকাল ছিল। তোকে নিয়ে গেল সারাক্ষণই তুই থাকবি আমার সঙ্গে, লজ্জায় পুতুল আমার সামনে বেশি আসবে না, পুতুলকে একা পাওয়া মুশকিল হবে এজন্য তোকে নিইনি। তবে তুই খুব মন খারাপ করেছিলি।

করব না? আমরা দুজন কি কেউ কাউকে ছেড়ে কোথাও যেতাম?

তা ঠিক। একজন ছিলাম আরেকজনের ছায়া।

তাছাড়া আমার সেই প্রথম মনে হল পুতুল শুধু তোর আত্মীয়। তোর ফুফাতো বোন, আমার কেউ না বা আমি ওদের কেউ না। এজন্যই বোধহয় আমাকে এভয়েড করলি তুই। আমাকে তোর সঙ্গে ওদের বাড়িতে নিলি না।

আরে না, ঘটনা ওটাই, পুতুলকে একা পাওয়ার চেষ্টা।

বহুদিন পর আজ তা বুঝতে পারলাম। সেই পুরনো অভিমানটাও আজ কাটল। মানুষের মন কী অদ্ভুত দেখ। কতকালের কত পুরনো অভিমান জমে

থাকে মনে। এক জীবনে কত অভিমান কখনই কাটে না। আবার কত অভিমান কতকাল পর কাটে।

সাদি বলল, ঠিকই বলেছিস। তবে তোর অভিমানটা কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম।

কীভাবে?

তোর আচরণে। তারপর থেকে পুতুলের কথা তুই আর আমাকে জিজ্ঞেস করতি না। আমি বলতে চাইলে তুই এড়িয়ে যেতি।

ঠিকই।

সাদি আবার সিগ্রেট ধরাল। শোন, পুতুল তখন নাইনে পড়ে। বয়সের তুলনায় বেশ বড়সড়। গোলগাল, একটু মোটা ধাঁচের মেয়ে। কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ, চুপচাপ স্বভাবের। কথা খুবই কম বলতো আমার সঙ্গে, শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। আমিও তাকাতাম। এভাবে তাকাতে তাকাতে দুজনের অজান্তেই দুজনে কেমন বদলে গেলাম। যখন তখন পুতুলের কথা মনে হয় আমার, পুতুলকে দেখতে ইচ্ছে করে। আমাদের এখান থেকে কতদূর ওদের গ্রাম, এমনকি আমাদের কলেজ, মানে মুনসিগঞ্জ থেকেও কতদূর, তবু প্রায়ই তোকে নিয়ে পুতুলদের বাড়ি চলে যেতাম আমি। সেই বর্ষায় গেলাম একলা। সেবারের বর্ষাটা বড় সুন্দর ছিল। বৃষ্টি কম কিন্তু জল বাড়ছিল ঠিকই। ফুফুর বাড়িটার কথা তো তোর মনেই আছে। গাছপালা ঘেরা। চারদিকে ফুল ফলের গাছ, বাঁশঝাড় আর ফাঁকে ফাঁকে ঘর। যৌথ পরিবার। ফুফুর ভাগে ছিল মাত্র দুটোঘর। দুটোঘরই পাটাতন করা। বড়ঘরটায় ফুফা ফুফু থাকত। ছোটটায় পুতুল আর ওর ছোট ভাইবোনগুলো। বড়আপার একটা ছেলে ছিল, সেও থাকত এই বাড়িতে। আমি গেলে, মানে তুই আমি যখন যেতাম আমরা থাকতাম ছোট ঘরটায়, পুতুলরা সবাই মিলে ওই এক ঘরে। সেই বর্ষায় ফুফা বাড়ি নেই। বড়আপা আর তার বর এসেছে। বড়ঘরটা তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে ওই ছোট ঘরটায় আমরা সবাই। সেবার চারদিন ওই বাড়িতে ছিলাম আমি। যেদিন চলে আসব তার আগের রাতে ঘটল ঘটনাটা। রাতটা ছিল পূর্ণিমার। চারদিকে বর্ষার জলে চাঁদের আলো পড়েছে। ফুফুর বাড়িতে অতিরিক্ত গাছপালারা জন্য গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে কোথাও কোথাও পড়েছে চাঁদের আলো আবার কোথাও কোথাও ডালপালার ছায়া। সামান্য হাওয়া ছিল। গাছের পাতায় মৃদু শব্দ হচ্ছিল।

সাদির কথার মাঝখানে রুমি বলল, তুই গল্প বলিস খুবই সুন্দর করে। পরিবেশটা একেবারে চোখে দেখা যায়।

সিগ্রেট টান দিয়ে সাদি বলল, এজন্য তুই দায়ি।

কেন, আমি কী করেছি?

ওই যে ছেলেবেলায় তোকে রোজ রাতে কিচ্ছা বলতে হতো! বানিয়ে বানিয়ে কিচ্ছা বলতে বলতে বলার অভ্যেস হয়ে গেল আমার।

বুঝলাম, বল।

সাদি বলল, এরকম রাতে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না আমার। রাত বেশি হয়নি, তবু গ্রাম এলাকার রাত, সন্ধেবেলাই মাঝরাত। পুতুলরা সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছু না ভেবেই দরজা খুলে বাইরে চলে এলাম আমি। উঠোনের দিকে পায়চারি করতে করতে আশ্চর্য এক ভাব এল মনে। নিজের অজান্তে ওই গানটা গাইতে শুরু করলাম। 'আমিও পথের মতো হারিয়ে যাব'। এক সময় দেখি কোন ফাঁকে পুতুলও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। উঠোনের কোণে কাপড় রোদ দেয়ার তার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু না ভেবে পুতুলের কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। কোনও কথা না, পেছন থেকে দুহাতে ওকে বেশ গভীর করে জড়িয়ে ধরলাম। পুতুল কোনও কথা বলল না, নড়ল না। সেই মুহূর্তে নিজের ভেতর একজন পুরুষমানুষকে জেগে উঠতে দেখলাম আমি। নিজের অজান্তে পুতুলের বুক হাতাতে লাগলাম, ঘাড়ের কাছে মুখ ঘষতে লাগলাম। এভাবে কতক্ষণ কে জানে, এক সময় দেখি আমরা দুজন চলে এসেছি ছোট ঘরটার দক্ষিণ দিককার বেড়ার কাছে। বেড়ার গায়ে পুতুলকে আমি চেপে ধরেছি। পুতুল নিজেই খুলতে শুরু করেছে তার সালোয়ারের ফিতা। বিশ্বাস কর ঠিক সেই মুহূর্তে পুতুলকে ডাকল ফুফু। পুতুল, পুতুল। কোথায় গেলি? সেই ডাকে দিশেহারা হয়ে গেল পুতুল। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পাজামার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রুমি বলল, যেভাবে বললি ঠিক এইভাবে ঘটনাটা তুই তিথিকে বলেছিস?

হ্যাঁ। একটি বর্ণও লুকোইনি।

শুনে কী বলল সে?

অদ্ভুত মেয়ে। অসাধারণ কিছু কথা বলল। বলল, এটা আসলে প্রকৃতির কারসাজি। প্রকৃতি চায়নি তোমার সঙ্গে ওই ব্যাপারটা হোক পুতুলের, এজন্য ঠিক সময়ে ফুফুর ঘুম সে ভাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার এবং মাসুদের ক্ষেত্রেও

একই কাণ্ড ঘটেছিল। আমাকে মাত্র চুমু খেতে যাবে মাসুদ, বিলু এসে ডাকল। কারণ প্রকৃতি চায়নি মাসুদ আমাকে চুমু খাক।

রুমি মুগ্ধ গলায় বলল, তিথি তো দেখছি অসাধারণ মেয়ে। চিন্তা ভাবনাই অন্যরকম।

ততো বটেই। কিন্তু তারপর যা করল সেটা শুনলে তুই আরও মুগ্ধ হবি। রাতেরবেলা হঠাৎ দেখি সে সালোয়ার কামিজ পরেছে। একটা পর্যায়ে আমরা যখন খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছি, ওর ঘাড়ের কাছে আমার মুখ, হাত বুকে, সালোয়ারের ফিতা খুলতে খুলতে তিথি বলল, আমি এখন পুতুল। সেই রাতে পুতুল তোমাকে যা দিতে চেয়েছিল, আমার কাছ থেকে এখন তুমি তা নাও। আর মাসুদের সেই না খাওয়া চুমুটা আমাকে তুমি এখন খেয়ে দাও। তাহলে আমাদের জীবনে কোনও হাহাকার থাকবে না, কোনও অপূর্ণতা থাকবে না।

এসব শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল রুমি।

ভোর পাঁচটার দিকে রুমি বলল, তুই কি ঘুমোবি?

সাদি অবাক হল। সকাল হয়ে গেছে এখন আবার কিসের ঘুম!

ইচ্ছে করলে এখন থেকে নটা দশটা পর্যন্ত ঘুমোনো যায়। তারপর বাড়ি গেলাম।

তুই ঘুমোতে চাচ্ছিস?

না। আমার ঘুম আসবে না। তোর কথা ভেবে বলছি।

আমি ঘুমোব না।

তাহলে একটা কাজ করি, চল রওনা দিই।

চল।

আমি তাহলে বাথরুমে ঢুকি।

ঠিক আছে।

রুমি বাথরুমে ঢুকল, টয়লেট সেরে দাঁত ব্রাশ করল। তারপর মুখ ধুয়ে একেবারে ফ্রেস হয়ে বেরুল। এবার তুই যা।

সাদি বাথরুমে ঢোকার পর স্লিপিংড্রেস খুলে প্যান্ট পরল রুমি, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রেডি হয়ে গেল। দুকাপ চা আনাল। তারপর টেলিফোনে রিসেপশানকে বলল, বিল পাঠাতে।

সব সেরে মাইক্রোবাসে চড়তে পৌণে ছটা বেজে গেল।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে, রুমি বলল, সাদি, আমার বাবার খবর কিছু জানিস তুই?

সাদি বলল, না। কোনও খবরই জানি না। তাঁর ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহও নেই।

বাবাকে তুই অবশ্য কখনই পছন্দ করিস না।

পছন্দ করার কোনও কারণও নেই। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে স্ত্রী মারা গেলেন কিন্তু সন্তানটি গেল বেঁচে। সেই সন্তানের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন না পিতা। সন্তানটিকে স্ত্রীর বড়বোনের কোলে দিয়ে সেই যে উধাও হলেন, আর

কখনও ফিরেই এলেন না। দুতিন মাসের মধ্যে আরেক জায়গায় বিয়ে করলেন, সংসার করতে শুরু করলেন।

কিন্তু আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর থেকে বাবা আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন।

স্বার্থের কারণে লেখেন।

হয়তো তাই।

হয়তো নয়, নিশ্চয় তাই। তুই আমেরিকায় চলে যাচ্ছিস এই খবর কোথা থেকে পেয়েছিলেন তিনি কে জানে, তখন খুবই উৎসাহিত হয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন, মা বললেন পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পর এলেন তিনি, অর্থাৎ তোকে রেখে চলে যাওয়ার পর সেই তাঁর প্রথম আসা।

হ্যাঁ, আমিও সেই প্রথম তাঁকে দেখলাম।

মা অবশ্য সেদিন তাঁকে অনেক কথা শুনিয়েছিলেন।

রুমি কথা বলল না।

সাদি বলল, সেদিনই আমি বুঝেছিলাম কোনও উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এসেছেন।

কী উদ্দেশ্য বল তো?

আমেরিকার মতো দেশে চলে যাচ্ছিস তুই। কত টাকা রোজগার করবি। পিতা হিসাবে তোর ওপর তার একটা অধিকার আছে, যদি সম্পর্কটা ভাল করা যায় তাহলে তোর কাছ থেকে অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা নেয়া যাবে। জীবনে প্রথম ভদ্রলোককে আমি দেখলাম কিন্তু সবমিলে তাঁকে আমার ভাল লাগল না। ভয়াবহ স্বার্থপর এবং সুবিধাবাদি মনে হল।

রুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বছর দেড়েক আগে স্ট্রোক করেছিল বাবার।

সাদি চমকাল। তাই না কি?

হ্যাঁ।

তোকে কে জানাল?

তিনি নিজেই। চিঠি লিখেছিলেন। খুবই ইনিয়ে বিনিয়ে, নিজের অপরাধের কথা বলে।

শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় আসল কথাটা লিখলেন।

আসল কথা মানে?

আমার স্ট্রোক করেছিল। ভাল চিকিৎসা হচ্ছে না। টাকা পাঠাও।

রুমি হাসল। বুঝলি কী করে?

এটা শিশুরাও বুঝবে।

তারপর একটু থেমে বলল, কত চাইলেন?

লাখখানেক।

এতটাকা?

হ্যাঁ। কারণ স্ট্রোকে পঙ্গু হয়ে গেছেন তিনি।

সাদি একটু থতমত খেল। কী?

হ্যাঁ, বাঁদিকটা প্যারালাইসড হয়ে গেছে। হাঁটাচলা তো করতে পারেনই না, কথাও বলতে পারেন না ঠিকঠাক মতো। মুখটা বেঁকে গেছে। কথা বলার চেষ্টা করেন, বোঝা যায় না কিছু।

নিশ্চয় এসব জেনে তোর হৃদয় দ্রবিভূত হল?

আমার জায়গায় তুই হলে তোর হতো না?

না হতো না।

কেন?

যে বাবা আমার সঙ্গে এমন করেছেন তাঁর জন্য আমার কোনও ফিলিংস তৈরি হতো না।

তুই একটু কঠিন হৃদয়ের।

আর তুই কোমল।

এজন্যই দ্রবিভূতের কথা বললি?

হ্যাঁ।

শব্দটা অনেকদিন পর শুনলাম। ভাল লাগল। কিন্তু কী কবর বল। সবাই তো আর এক রকম হয় না। আমার মনটা একটু নরম ধরনের।

বুঝলাম, কিন্তু একলাখ পাঠালি তুই?

না অত পাঠাইনি। সাড়ে বারোশো ডলার পাঠিয়েছিলাম। হাজার পঞ্চাশেক টাকা।

শুনে সাদি খুবই বিরক্ত হল। কোনও মানে নেই।

রুমি কথা বলল না।

মাইক্রোবাস তখন চীনমৈত্রী সেতু পার হচ্ছে।

সাদি বলল, তোর বাবার ছেলেমেয়ে কজন রে?

চট করে সাদির মুখের দিকে তাকাল রুমি। কথাটা কী রকম যেন লাগল।

মুখটা ম্লান হল সাদির। তুই কি মন খারাপ করলি?

না না তা নয়।

তাহলে?
বাবার ছেলেমেয়ে কজন শুনতে কেমন লাগে না?
সাদি হাসল। তা ঠিক। কিন্তু এছাড়া কীভাবে জিজ্ঞেস করব কথাটা?
তাও ঠিক।
তাহলে বল।
একছেলে তিনমেয়ে।
বড় কে?
বড় তো আমি।
না না তোকে ছাড়া?
ভাইটাই বড়।
কী নাম?
খোকন। বোন তিনটির নাম আশা নিশা দিশা।
খোকন কী করে?
এমএ পাশ করেছে। বেশ ভাল একটা সাবজেক্টে। বিদেশি ব্যাংকে চাকরি করে।
ওসব ব্যাংকে বেতন খুব ভাল।
আমিও শুনেছি।
বোনগুলোর বিয়ে হয়েছে?
দুজনের হয়েছে। শুধু দিশা বাকি।
সে কী করে?
ইডেনে পড়ে। ইংরেজিতে অনার্স।
বড়বোন দুটোর পড়াশুনো?
দুজনেই মাস্টার্স করেছে।
তার মানে পড়াশুনোয় মনোযোগ আছে সবারই।
আছে। ভাল বিয়ে হয়েছে বোন দুটোর। আশা থাকে কানাডায়, টোরেন্টোতে। জামাইর একটা গ্রোসারিশপ আছে।
তার মানে অবস্থা ভাল?
হ্যাঁ। নিশা এবং তার জামাই দুজনেই চাকরি করে। সরকারি চাকরি।
ছেলেমেয়েরা বাপকে দেখে না?
দেখবে না কেন?
তাহলে তোর কাছে তিনি টাকা চাইলেন কেন?

চিঠিতে লিখেছিলেন মাদ্রাজের ভেলোরে যাবেন ট্রিটম্যান্টে। লাখ তিনেক টাকা লাগবে। এত টাকা জোগাড় করতে পারছেন না।

বাই দা বাই, খোকন কি বিয়ে করেছে?

না।

বয়স কত?

তিরিশ টিরিশ হবে।

তোর বাবা কী করতেন জানিস?

খুব ভাল জানি না। হয়তো ছোটখাট বিজনেস টিজনেস করতেন।

তাঁর দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

কুমিল্লায়। নবীনগর থানা।

সাদি অবাক হল। তুই এসব জানলি কী করে? তোকে তো কখনও তাঁদের ব্যাপারে কথা বলতে দেখিনি। বাবার কথা শুনলে তুই বরং বিরক্ত হতি।

এখন আমার কথা শুনলে তুইও বিরক্ত হবি।

কেন?

মনে হয়।

বল, শুনে বিরক্ত হই।

তার আগে তোকে একটু পটাই।

মানে?

এক্ষুণি টের পাবি।

মাইক্রোবাসের পেছনের সিট থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা টেনে আনল রুমি। ব্যাগের চেন খুলে দুকার্টুন বেনসান সিগ্রেট বের করল। দুটো কার্টুন এক সঙ্গে সাদির কোলের ওপর দিয়ে বলল, নে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল সাদি। আমার জন্য?

তাহলে কার জন্য?

দুই কার্টুন পুরোটাই আমার?

হ্যাঁ।

কার্টুন দুটো গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরল সাদি। তুই তো জানতি না আমি সিগ্রেট খাই!

না তা জানতাম না।

তাহলে?

ট্যাক্সফ্রি শপ থেকে কিনেছিলাম। যদি কেউ খায় তাকে দেব, এরকম ভেবেছিলাম।

রাতে যে কিছু বললি না?

ভেবেছি তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

ভাল।

তো এখন একটা কার্টুন খোল। সিগ্রেট খা।

সাদি চোখ মটকে বলল, মতলবটা কী? কী বলবি?

রুমি হাসল। ওই যে বললাম তোকে পটাতে হবে। খা সিগ্রেট খা। কার্টুন খোল।

খুলতে হবে না।

কেন?

পকেটে সিগ্রেটের প্যাকেট আছে। এখনও শেষ হয়নি। ওটা শেষ করে তারপর এটা খুলব।

তোর ব্রাণ্ড কী?

গোল্ডলিফ।

আমি তো আনলাম বেনসান!

তারপরই যেন কথাটা মনে পড়ল রুমির। কিন্তু তোকে তো আমি বেনসানই খেতে দেখছি।

সাদি হাসল। তোর অনারে এক প্যাকেট কিনেছিলাম।

মানে?

তোর সামনে অল্পদামি সিগ্রেট খাই কী করে!

তোর কথার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

তুই আসলে আগের মতোই সরল আছিস। বেনসান আমি এফোর্ট করতে পারি না এজন্য গোল্ডলিফ খাই। কিন্তু তুই দেশে আসছিস এতদিন পর, তোর সামনে ওই সিগ্রেটটা খেতে লজ্জা করছিল। এজন্য বেনসান কিনলাম।

বুঝেছি। এবার একটা ধরা বাপ।

পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল সাদি। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের মুঠোয় তিনটি লাইটার গুঁজে দিল রুমি।

সাদি আবার অবাক হল। একি?

লাইটার।

তা বুঝতে পারছি। কিন্তু এতগুলো কেন?

তোর জন্য। আরও আছে। এখন সিগ্রেটের কার্টুন বের করতে গিয়ে যে কটা হাতে উঠেছে দিয়ে দিলাম। এগুলো সস্তা লাইটার। এক ডলারে তিনটা পাওয়া যায়।

সাদি আর কথা বলল না। সিগ্রেট ধরাল।

রুমি বলল, তুই কি আমার সঙ্গে একটা প্রতিজ্ঞা করবি?

কিসের প্রতিজ্ঞা?

আমি কিছু কথা বলব ওসব কথা শুনে তুই রাগ কিংবা অভিমান করবি না। আমাকে ভুল বুঝবি না। কথাগুলো গভীরভাবে ভাববি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবি এবং ভেতরকার আসল অর্থটা বোঝার চেষ্টা করবি।

সাদি সিগ্রেটে টান দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে রুমির মুখের দিকে তাকাল। কী এমন কথা রে?

কথাগুলো তোকে আমি না বললেও পারি। কাউকে বলিওনি। এমন একটা অদ্ভুত অনুভূতির কথা,আমি চাই ব্যাপারটা তোর সঙ্গে শেয়ার করি। তাছাড়া আমার জীবনের প্রায় কোনও কিছুই তোর কাছে লুকোনো নেই।

সাদি মায়াবি গলায় বলল, আমি তোকে ভুল বুঝব না। তুই নিশ্চিন্তে বল।

রুমি একটু উদাস হল, একটু আনমনা হল। মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর বিষণ্ন গলায় বলল, ছাব্বিশ বছর বয়সে বাবাকে আমি প্রথম দেখি। তার আগে বড় হয়ে ওঠার সময় থেকে, বাবা ব্যাপারটি বোঝার পর থেকে আমার জন্মের ঘটনা, মায়ের মৃত্যু, বাবার ওভাবে চলে যাওয়া, আর কখনই ফিরে না আসা, আমার খোঁজখবর না নেয়া এসব এত শুনেছি আমি, কিন্তু তোকে আমি কখনই বলিনি, এতকিছু শোনার পরও কিন্তু বাবার ওপর আমার কেন যেন কোনও রাগ কিংবা অভিমান হতো না।

কিন্তু মুখ দেখে যে মনে হতো তুই বিরক্ত হচ্ছিস!

ওটা তোদেরকে দেখাবার জন্য। আসলে হতাম না।

কী বলছিস?

সত্যি! আমি কখনও বাবার ওপর রাগ করতে পারতাম না। সবাই তাঁর ওপর খুব ক্ষিপ্ত। কথা উঠলে নানা রকমের কথা বলতো সবাই। খুবই অসম্মানজনক কথা, অপমানকর কথা। শুনে আমি যেতাম স্তব্ধ হয়ে। আমি কোনও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতাম না। আনমনা হয়ে যেতাম।

এটা আমি অবশ্য খেয়াল করেছি। বিরক্তির ভাবটা তোর মুখে থাকত কিন্তু তুই তোর বাবার বিরুদ্ধে কখনও কোনও কথা বলতি না।

কেন বলতাম না জানিস, বাবার জন্য আমার খুব মায়া হতো।

শুনে আশ্চর্য লাগছে আমার। যে বাবা তোর সঙ্গে এমন করেছেন তাঁর জন্য তোর মায়া হতো?

হ্যাঁ। মনে হতো আমার বাবা যা করেছেন আমার সঙ্গে করেছেন, অন্যে কেন ওই নিয়ে কথা বলবে!

কবে থেকে এই ফিলিংসটা তোর হতো?

বোধহয় নাইন টেনে পড়ার সময় থেকে। অর্থাৎ মাবাবা ভাইবোন এবং মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা যখন বুঝতে শিখেছি তখন থেকে। আর একটা কারণও বোধহয় ছিল।

সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল সাদি। কী বলতো!

তোর বাবাকে, মানে খালুজানকে দেখে দেখে যেন অদেখা বাবাকে আরও গভীর করে ভালবাসতে শুরু করেছিলাম আমি।

অবাক চোখে রুমির মুখের দিকে তাকাল সাদি।

রুমি বলল, খালুজান তো ছিলেন কাজির পাগলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই বড়পাকে আর তোকে ডাকতেন তিনি। আমাকেও ডাকতেন। বড়ঘরের বারান্দায় রাখা হাতাঅলা চেয়ারটায় বসতেন তিনি। আমরা কাছে গেলে একহাতে বড়পাকে জড়িয়ে ধরতেন। আরেক হাতে ধরতেন তোকে। মানুষের তো দুটোই হাত, দুই হাতে দুই সন্তানকে ধরেছেন তিনি, আমাকে ধরবেন কোন হাত দিয়ে? তবু তোকে ধরা হাত দিয়ে তিনি আমাকেও ধরতে চাইতেন। বলতেন দুটোই আমার ছেলে। এজন্য একহাতে দুটোকে ধরেছি। তাঁর উদারতার কোনও সীমা ছিল না, কিন্তু আমার মনটা খারাপ হতো। মনে হতো আমাকে খুশি করার জন্য এই আচরণটা তিনি করছেন। যেহেতু আমি এই বাড়িতে আছি, খালা আমাকে আপন সন্তানের মতো বড় করছেন এজন্য খালুজানও আমাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কিন্তু খালু না হয়ে তিনি যদি আমার বাবা হতেন তাহলে তোর জায়গায় থাকতাম আমি, আর আমার জায়গায় তুই। কিন্তু আপন সন্তানই সন্তান, স্ত্রীর ছোটবোনের সন্তান যত কাছেই থাক সন্তানের জায়গা সে কখনও দখল করতে পারে না। নিজের অজান্তেই মানুষের মমতা চলে যায় আপন সন্তানের দিকে, হাত চলে যায় আপন সন্তানের দিকে। যে কারণে খালুজান দুহাতে ধরতেন তোদের দুজনকে, তারপর আমি সামনে থাকতাম বলে, আমি কষ্ট পাব ভেবে আমাকেও ধরতেন। এটা তাঁর অপরাধ নয়, হিউম্যান নেচার। নিজের অজান্তেই তিনি তা করে ফেলতেন।

সাদি অবাক হয়ে রুমির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রুমি বলল, কিন্তু খালুজান সত্যিকার অর্থেই খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আমার নামটা তিনি রেখেছিলেন। রুমি। আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে তোর নাম রাখলেন সাদি। শেখ সাদির কথা মনে রেখে। রুমিও শেখ সাদির মতো বিখ্যাত একজন। খালুজানের মৃত্যুতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

সাদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাবা মারা গেলেন পনের বছর হতে চলল। সময় কী দ্রুত চলে যায়, না!

সত্যি তাই, সময় বড় দ্রুত চলে যায়।

রুমি আবার উদাস হল।

সাদি বলল, যা বলতে চাইছিস তাই বল।

আসলে বলতে চাইছি বাবার কথা।

তা বুঝতে পারছি। বল।

জীবনে প্রথম বাবাকে দেখলাম, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পর তোদের বাড়িতে এলেন, আমার জন্যই এলেন। আমার আমেরিকায় চলে যাওয়ার খবর পেয়েই এলেন। খালা তাঁকে কত শ্লেষ করলেন, তিনি দুএকবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করে বসে রইলেন। কী বলব তোকে, আমার তখন এত মায়া লাগছিল তাঁর জন্য। আমি একবার খালাকে বলতেও চাইলাম, তুমি থামো খালা। বাবা তো তোমাদের সঙ্গে কোনও অন্যায় করেননি। করেছেন আমার সঙ্গে। যদি কথা কিছু বলতে হয় আমি বলব! কিন্তু খালার মুখের ওপর আমি কখনও কোনও কথা বলি না। সেদিনও বলিনি। তবে আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল। অর্থাৎ বাবার পক্ষে দাঁড়ানো।

সাদি বলল, সত্যি ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত।

রুমি বলল, এটা আসলে মনের ব্যাপার। মানুষের মন খুবই বিচিত্র, খুবই জটিল।

এসব কথা যখন উঠলই তোকে আমি অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

সিওর।

তুই যেভাবে তোর বাবার কথা বলছিস আজ, অর্থাৎ বাবার ব্যাপারে তোর আবেগ অনুভূতিটা আমি বুঝতে পারছি, মায়ের ব্যাপারেও কি তোর অনুভূতি এরকম?

না। একদমই না। মা নেই একথা আমি কখনও ফিল করিনি। আমি অন্য একজন মানুষের গর্ভে জন্মেছি, মানুষ হচ্ছি আরেকজনের কোলে এরকম কথা আমার কখনও মনে হয়নি।

আশ্চর্য ব্যাপার! কেন?

বোধহয় খালার কারণে। খালার কোনও আচরণে কখনই আমার মনে হয়নি আমি এই মানুষটার গর্ভে জন্মাইনি। তাকে দেখে আমি বুঝেছি, মা এরকমই। আমার মনে আছে, সাত আট বছর বয়স পর্যন্ত তুই আর আমি খালার বুকের দুধ খেতাম। খালা বসে আছেন, আমরা দুজন দুদিক থেকে গিয়ে তাঁর বুকে মুখ দিতাম। তোর দিকে তাঁর মনোযোগ কতটা থাকত জানি না কিন্তু ওসময় গভীর মমতায় তিনি আমার মাথায় একটা হাত রাখতেন।

রুমি একটু উদাস হল। তোদের কাছ থেকে এতদূর চলে গেছি আমি, একা একা জীবন কাটাই দূরদেশে, কিন্তু আমার সব সময় মনে হয় আমি রয়ে গেছি খালার বুকের একপাশে। খালার একখানা মায়াবি হাত আছে আমার মাথার ওপর।

সাদির মুখটা উজ্জ্বল হল। খুব ভাল লাগল রে তোর কথাটা শুনে।

কিন্তু মানুষের মন কী বিচিত্র দেখ, এই খালাই যখন আমার বাবাকে আমার কারণে শ্লেষ করছিলেন, আমি কিন্তু খালার পক্ষে ছিলাম না। নিজের অজান্তেই আমি যেন বাবার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। কেন, তার ব্যাখ্যা আমি করতে পারব না। তারপর যে কাজটা করেছিলাম সেটা সত্যি খুব অদ্ভুত।

রুমি চুপ করে গেল।

সাদি বলল, কী করেছিলি?

দুপুরের পর বাবার যখন চলে যাওয়ার কথা হচ্ছে, তার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি।

কোথায় গেলি?

মিয়াদের বানাগবাড়ির পাশ দিয়ে ছিল আমাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা। আমি গিয়ে সেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তাই নাকি! কেন?

নিভৃতে বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

কিন্তু এই যখন তোর অনুভূতি ছিল বাবার ব্যাপারে, তুই আমি তো ঢাকাতেই পড়াশুনো করতাম, মানে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ে আমরা দুজন ঢাকায় চলে এসেছিলাম। জগন্নাথে পড়তাম। তোর বাবা ফ্যামিলি নিয়ে ঢাকায়ই থাকতেন। তোর ব্যাপারে তাঁর কোনও ফিলিংস না থাক, তোর যখন এত গভীর ফিলিংস ছিল, তুই তো ইচ্ছে করলে ঠিকানা জোগাড় করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতি। যোগাযোগ রাখতে পারতি।

তা পারতাম।

করিসনি কেন?

জানি না। বোধহয় বাবাকে দেখার আগে তাঁর ব্যাপারে অতটা টান আমার ছিল না। তাঁকে দেখার পর আমি যেন ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে গেলাম।

তাহলে এই যে তুই দেশে ফিরলি, ঢাকায় রাত কাটাচ্ছিস হোটেলে, তুই তোর বাবার ওখানে গেলি না কেন?

তাঁকে আমি জানাইনি যে আমি দেশে আসছি।

কেন?

কোনও কারণ নেই। এমনি। তাছাড়া তিনি যদি জানতেনও আমি দেশে আসছি তবু প্রথমে আমি তাঁর কাছে যেতাম না। খালার সঙ্গে দেখা না করে তাঁর সঙ্গে দেখা আমি করতাম না।

মানে খালা আগে তারপর বাবা।

তুই যদি শ্লেষ করেও বলিস আমি দুঃখ পাব না। কারণ খালা তো আসলে খালা নয়, খালা তো আসলে মায়েরও অধিক।

তাহলে খালা যখন বাবাকে কথা শোনাচ্ছিলেন, এবং কথাগুলো যৌক্তিক, তখন তুই খালার পক্ষে না থেকে বাবার পক্ষ নিয়েছিলি কেন?

বাহ্যিকভাবে নিইনি, খালাকে বুঝতে দিইনি।

তা না হোক, ভেতরে ভেতের তো নিয়েছিলি?

তা নিয়েছিলাম।

কেন?

এর কোনও ব্যাখ্যা আমি করতে পারব না। বললাম যে মানুষের মন বড় বিচিত্র।

সত্যি মানুষের মন বড় বিচিত্র। তিথিকে দেখেই আমি তা বুঝি।

কেন কী করে তিথি?

এত ভাল মেয়ে সে, কিন্তু আমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল রাখতে পারে না।

মানে?

উঠতে বসতে ঝগড়া করে মায়ের সঙ্গে।

একথা শুনে রুমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলিস কী?

হ্যাঁ।

তার মানে সংসারে অশান্তি হয়?

রুমি মাথা নিচু করে বলল, খুবই অশান্তি হয়। মার কোনও কথাই শোনে না তিথি।

তাহলে একসঙ্গে তোরা থাকছিস কী করে?

অশান্তি করেই।

মানে?

তিথি এক মুহূর্তও থাকতে চায় না। ঢাকায় গিয়ে আলাদা বাসা নিয়া থাকার জন্য চাপাচাপি করে। কিন্তু আমার সামর্থ নেই।

সামর্থ নেই কেন? তুই তো আমাকে জানিয়েছিলি মোটামুটি ভাল বিজনেস করিস তুই।

শুরু করেছিলাম ভালই। কিছু জমি বিক্রি করে লাখ চারেক টাকা জোগাড় করে দিয়েছিলেন মা, তোর টাকা ছিল আড়াইলাখ, মোট সাড়ে ছয়লাখ টাকা।

আমার আড়াইলাখ মানে আমেরিকা যাওয়ার সময় যে টাকাটা খালা আমাকে জোগাড় করে দিয়েছিলেন সেটা?

হ্যাঁ। মাস ছয়েকের মধ্যেই তো টাকাটা তুই পুরো পাঠিয়ে দিয়েছিলি।

একটু থামল সাদি। তারপর বলল, থাক এসব কথা। তুই তোর বাবার কথা বল।

না এখন আর ওসব কথা বলতে ভাল লাগবে না। সংসারে অশান্তির কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে। তুই আমাকে সব খুলে বল।

বলবো তো বটেই।

এখুনি বল।

মাত্র দেশে এলি তুই, এখুনি এসব জটিলতার কথা বলব। মন খারাপ হবে না তোর?

হলেও সামলাতে পারব আমি। দুঃখকষ্ট সামলাবার আশ্চর্য এক ক্ষমতা আছে আমার। কী যে এক দুঃখ বুকে চেপে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলাম আমি, কী যে এক দুঃখ চিরকাল বুকে চেপে রাখতে হবে আমার আমি ছাড়া কেউ তা জানে না।

তুই কি মিলির কথা বলছিস?

থাক ওসব কথা। তুই আমাদের সংসারের কথা বল।

মোট সাড়ে ছলাখ টাকা নিয়ে বিজনেস শুরু করেছিলাম।

হ্যাঁ আমাকে তো তুই চিঠিতে লিখেছিলি কাপড়ের বিজনেস। ইস্‌লামপুরে।

তোর মনে আছে?

থাকবে না?

কিন্তু তিথির চেহারা এবং নাম ভুলে গিয়েছিলি।

সত্যি কেন যে ভুললাম!

যাহোক, শোন। ভালই হচ্ছিল বিজনেস। তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার হয় মাসে। আমার পার্টনার অল্পবয়সি একটা ছেলে, মালেক।

কোথাকার ছেলে?

বিক্রমপুরেরই। কোলাপাড়ার। অল্প বয়সেই বিজনেসটা সে ভাল বুঝেছে। বছরখানেক বিজনেস করে বিয়ে করলাম। ঢাকায় একটা বাসা নিলাম গেন্ডারিয়াতে। তিথিকে নিয়ে ভালই ছিলাম। কিছুদিন পর বিজনেসে ক্র্যাইসিস দেখা দিল। দুজনে মিলে দশলাখ টাকার একটা লট কিনেছিলাম। পাকিস্তানী একটা কাপড়। কাপড়টার দাম রাতারাতি পড়ে গেল। যেখানে পাঁচসাত লাখ টাকা লাভ হবে সেখানে চারলাখ টাকা লস। বিশ্বাস কর পর পর তিনটা মার খেলাম এইভাবে। পুরো টাকাটা গেল।

কতদিনের মধ্যে?

সাত আটমাস।

কই এসব কথা তো তুই আমাকে জানাসনি!

ইচ্ছে করেই জানাইনি।

কেন?

তুই টেনশান করবি। তিথি অবশ্য আমাকে বলেছিল তোকে জানাতে। মা মানা করলেন। ওই নিয়ে মার সঙ্গে প্রথম দ্বন্দ্বটা শুরু হয় তিথির। মা বললেন একছেলের সুবিধার জন্য আরেক ছেলেকে কষ্টের মধ্যে ফেলব না আমি। বিজনেসে লস করেছে দরকার নেই আর বিজনেসের। চাকরি বাকরি করুক। তিথি বলল, চাকরি করে ঢাকায় বাসা নিয়ে চলা কঠিন। মা বললেন দরকার নেই ঢাকায় বাসা রাখার। গ্রামের বাড়িতে এসে থাক। আলটিমেটলি তাই আমাকে থাকতে হচ্ছে। এটাই মায়ের সঙ্গে তিথির অশান্তির বড় কারণ।

তার মানে কারণটির সঙ্গে আমি জড়িত।

কথাটা বুঝতে পারল না সাদি। বলল, কী রকম?

খালা যদি তোকে বলতেন আমাকে তোর অবস্থার কথা জানাতে, যদি টাকা পয়সা দিয়ে আমি তোকে সাহায্য করতে পারতাম, আবার বিজনেস শুরু করতে পারতি তুই, ঢাকায় বাসা নিয়ে থাকতে পারত তিথি তাহলে নিশ্চয় অশান্তিটা হতো না।

সাদি মাথা নিচু করে রাখল।

রুমি বলল, এক্ষেত্রে তুইও খুব বোকার মতো কাজ করেছিস!

কী?

খালা মানা করেছেন ঠিক আছে, তুই গোপনেও আমাকে সব জানাতে পারতি। অবস্থাটা তুলে ধরতে পারতি আমার কাছে। আমি খালাকে জানতে দিতাম না কিছু, চেষ্টা করতাম তোকে সাহায্য করতে। আমি তো শুধু তোর ভাই নই, বন্ধুও।

সাদি কথা বলল না।

রুমি বলল, এখন কী করছিস তুই?

চাকরি।

কোথায়?

একটা টেক্সটাইল মিলের হেড অফিসে। মতিঝিলে অফিস।

কত বেতন পাচ্ছিস?

সাড়ে পাঁচ হাজার।

কতদিন হল চাকরি?

ছবছর।

ছবছর ধরে গ্রামে থাকছিস তোরা?

হ্যাঁ।

তার মানে এটাই সংসারের অশান্তির কারণ?

মূল কারণ হয়তো এটাই। তারপর থেকেই মাকে তিথি একদম সহ্য করতে পারে না।

মাইক্রোবাস তখন গ্রামে ঢুকেছে। যেন হঠাৎ করেই তা খেয়াল করল সাদি। বলল, এসে পড়েছি। এখন এসব কথা থাক। পরে হবে।

এতকাল পর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে যে এলাকায় সেই এলাকায় ফিরে এসেছে রুমি। কিন্তু আচরণে কোনও উচ্ছ্বাস দেখা গেল না তার। সে কীরকম আনমনা হয়ে রইল।

রুমিকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন খালা।

রুমিরও চোখ ভরে গেছে জলে। তবুও খালার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁকে শান্তনা দিচ্ছিল সে। কেঁদো না খালা, কেঁদো না।

বাড়ির অনেকদিনের পুরনো কাজের লোক রমিজকে নিয়ে রুমির ব্যাগ সুটকেস গাড়ি থেকে নামিয়ে বড়ঘরে রাখছিল সাদি।

রুমি একবার সাদির দিকে তাকাল। চোখ মুছে বলল, গাড়ি ভাড়া কত রে?

সাদি বলল, ওসব তোর ভাবতে হবে না। আমি দেখছি।

খালা কান্না সামলে বললেন, ওর কাছে টাকা আছে।

তুমি দিয়েছ?

হ্যাঁ।

কেন?

দিয়েছি, এসব নিয়ে তোর ভাববার দরকার কী?

তারপর আঁচলে চোখ মুছলেন খালা। তোর না কালরাতে আসার কথা?

একহাতে খালাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকল রুমি। খাটের ওপর বসল। কালরাতেই এসেছি। প্লেন লেট করেছে পাঁচঘণ্টা। এজন্য অতরাতে আর এলাম না।

ছিলি কোথায়?

হোটেলে। সাদি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

কেন হাসির বাড়িতে চলে যেতি?

অতরাতে কারও বাড়িতে যাওয়া যায় না।

এ সময় ঘরে ঢুকল সাদি। ওটা কি অন্যের বাড়ি নাকি? যত রাতে ইচ্ছা যাওয়া যায়। যাওয়া হয়নি আমার জন্য। কেন যে বড়পার বাড়ির কথা আমার মনে হয়নি।

রুমি বলল, তুই কি খেয়াল করেছিস সাদি, কাল থেকে এত কথা বলছি দুজনে কিন্তু বড়পার কথা একবারও বলিনি।

ঠিকই।

তখনও খালাকে একহাতে জড়িয়ে রেখেছে রুমি। এখন খালার মুখের দিকে তাকাল সে। বড়পা আছেন কেমন?

খালা হতাশ গলায় বললেন, আর থাকা!

রুমি চমকাল। কেন, কী হয়েছে?

খালা কথা বলবার আগেই সাদি বলল, এখনই সব কথা বলে ওর মনটা খারাপ করে দিও না মা। মাত্র এলো। তুমি ওঠো। নাশতা টাশতার ব্যবস্থা কর।

ওসব করা আছে।

রুমি সাদির দিকে তাকাল। কিন্তু বড়পার কী হয়েছে আমাকে বল।

সাদি বলল, শুনবিই তো সব। এত অস্থির হওয়ার কী আছে। সাংসারিক ঝামেলা, অন্য কিছু না। বড়পাও বেশ একটা অশান্তিতে আছে। আমি তোকে পরে সব বলব।

তারপর মায়ের দিকে তাকাল সাদি। মা, ওঠো তুমি। খিদে পেয়ে গেছে।

খালা উঠলেন। রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

রুমি তখন বড়পার কথা ভাবছে। এ বাড়ির বড়মেয়ে। নাম হাসি। একমাত্র মেয়ে। তবু কী যেন কী কারণে তাকে ছেলেবেলা থেকেই বড়পা ডাকতে শুরু করেছিল রুমি এবং সাদি। ওদের চে' পাঁচ ছবছরের বড়। রুমি এবং সাদি যখন ক্লাশ সেভেনে পড়ে তখন বিয়ে হয়ে যায় বড়পার। দেখতে খুব একটা ভাল না সে, এজন্য খালু চাইছিলেন যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ফেলা যায়। এসএসসির পর পরই পাত্র জোগাড় হল। বিয়ে হয়ে গেল বড়পার। জামাইর নাম মোবারক। দুবার পরীক্ষা দিয়ে বিএ পাস করতে পারেনি। বাবার ছোটখাট একটা কাপড়ের দোকান ছিল সদরঘাটে সেই দোকানে বসতো সে। ওখানে বসতে বসতে কাপড়ের ব্যবসার ভেতরকার মারপ্যাচটা বুঝে গেল। তারপর কেমন কেমন করে যেন উন্নতি করতে লাগল। বড়পার সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন নিজের পায়ে মাত্র দাঁড়াচ্ছে সে। বিয়ের পর ধা ধা করে উন্নতি। বছর সাতেকের মাথায় ইসলামপুরে চারখানা কাপড়ের দোকান, ঘরে তিনখানা ছেলেমেয়ে। বড়টা ছেলে, সানি। তারপর মেয়ে দুটো রত্না, স্বপ্না। রুমি যখন আমেরিকায় যায়, রত্নার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন বড়পা। দুটো টেক্সটাইল মিল করে ফেলেছেন দুলাভাই। কয়েক বছরের মধ্যে শোনা গেল আরেকটা টেক্সটাইল মিল হয়েছে। স্বপ্নারও বিয়ে দিয়েছেন, সানিকে বিয়ে করিয়েছেন। মেয়ের জামাইরা দুজনে দেখে দুটো টেক্সটাইল মিল, সানি দেখে একটা। দুলাভাই আছেন তাঁর কাপড়ের দোকান নিয়ে।

এই অবস্থায় কী অশান্তি হতে পারে বড়পার!

রুমির মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

খালা বেরিয়ে যেতেই সাদিকে ধরল সে। আমার খুব টেনশান হচ্ছে। বড়পার কী হয়েছে বল আমাকে।

রুমির মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে সাদি বলল, দুলাভাই আবার বিয়ে করেছেন।

রুমি ভাবতেই পারেনি এই ধরনের একটা কথা শুনতে হবে তাকে। ফ্যাল ফ্যাল করে সাদির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কী বললি? বিয়ে করেছেন?

হ্যাঁ।

কবে?

বছর দেড়েক হল।

দেড় বছর হয়ে গেছে আর তোরা আমাকে তা জানাসনি!

কী হবে জানিয়ে?

কী হবে মানে? সংসারের কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে জানাবি না আমাকে!

আমি জানাতে চেয়েছি। মা মানা করেছেন। যুক্তি ওই একটাই, তুই বিদেশে আছিস, এসব শুনলে টেনশান হবে, মন খারাপ করবি।

রুমি বিরক্ত হল। এটা আসলে কোনও যুক্তি নয়। মন খারাপ হবে বলে কিছুই জানতে পারব না আমি! তার মানে কেউ মারা গেলেও মন খারাপ হবে বলে আমাকে তোরা তা জানাবি না!

সাদি অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, এসব আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। বলতে হয় তোমার খালাকে গিয়ে বল।

রুমি চুপ করে রইল।

সাদি বলল, চল পুবের ঘরে যাই, কাপড় চোপড় বদলাই।

চল।

রুমি উঠল, সাদির পিছু পিছু পুবের ঘরে এল। হাতে হ্যান্ডব্যাগ।

এই ঘরটা পাটাতন করা। পুরনো দিনের উঁচু একটা পালঙ্ক আছে। একটা আলনা আর একটা কাঠের আলমারি আছে। একসময় বড়সড় একটা টেবিলও ছিল। রুমি এবং সাদি সেই টেবিলে বসে পড়ত। এখন টেবিলটা নেই।

এই ঘরে এসে টেবিলটার কথা মনে পড়ল রুমির। বলল, টেবিলটা কইরে?

সাদি বলল, উত্তরের ঘরে। ওই ঘরে আমি থাকি। টেবিলটা দরকার হয়, এজন্য নিয়ে গেছি।

রুমি আর কথা বলল না। হ্যান্ডব্যাগ থেকে ট্রাউজার আর টিশার্ট বের করে পরল।

সাদি বলল, আমিও কাপড়টা বদলে আসি।

কোত্থেকে?

আমার ঘরে যাই।

পরে যা।

কেন?

একা থাকতে ভাল লাগবে না আমার।

সাদি হাসল। আমেরিকায় একা থাকিস না?

সেখানে একা থাকি বলেই তো দেশে এসে একা থাকব না। আচ্ছা শোন, আমাকে তো বোধহয় এই ঘরে থাকতে হবে, না?

হ্যাঁ।

আর তুই কোথায় থাকবি?

আমার ঘরে।

কেন বাপ, ওই ঘরে কি তোমার বউ আছে?

না বউর স্মৃতি আছে।

আমার সঙ্গে এই ঘরে থেকে স্মৃতিটাচারণ করো।

আচ্ছা।

তখনি রমিজ এসে দাঁড়াল এই ঘরের দরজায়। নাশতা কি এই ঘরে দিব?

রুমি বলল, এই ঘরেই দে। খালাকেও আসতে বল।

কিন্তু নাশতার বহর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল রুমির। রমিজ শুধ আনছেই, আনছেই। পাঁচ রকমের পিঠাই আনল। ভাঁপা, পাটিসাপটা, মালপুয়া, বোড়া আর কাটাপিঠা। তারপর আনল ছিটরুটি, ছিটরুটির সঙ্গে মুরগি। সবশেষে একটা প্লেটে আমের মুরব্বা নিয়ে এলেন খালা।

রুমি বলল, এত খাবার!

রুমির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে খালা বললেন, খা বাবা, খা। তুই তো এসব খাবার পছন্দ করিস।

পছন্দ করি বলে একদিনেই সব খেয়ে ফেলব?

পাটাতনের ওপর পাটি বিছিয়ে খাবারগুলো রাখা হয়েছে। রুমি আর সাদি প্লেট নিয়ে বসল সেই পাটিতে। খালা বসলেন রুমির পাশে।

ওরা খেতে শুরু করেছে, খালা বললেন, রুমি, বাবা, তুই কী কাজ করিস আমেরিকাতে?

একটা পাটিসাপটায় মাত্র কামড় দিয়েছে রুমি, চট করে সেটুকু গিলে বলল, শুনলে তোমার মন খারাপ হবে খালা।

কেন?

আমাদের দেশে এই ধরনের কাজ আমার মতো শিক্ষিত ছেলেরা করে না।

কাজটা কী?

সাদি বলল, তুমি ওসব শুনে কী করবে?

বারে, শুনব না আমি!

তারপর আবার রুমির দিকে তাকালেন খালা। বল বাবা।

ড্রাইভারি করি।

খালা যেন চমকালেন। মানে?

গাড়ি চালাই। গাড়ির ড্রাইভার। ভাড়ার গাড়ি। ওগুলোকে বলে ইয়েলোক্যাব। ওসব দেশে কাজ কাজই। সব কাজেরই মূল্য আছে। টাকা রোজগার হলেই হলো। অনেকেই এই কাজ করে। কাজটায় পয়সা পাওয়া যায় ভাল।

খালা একটু মন খারাপ করলেন। যত ভাল পয়সাই পাওয়া যাক, কাজটা তো ভাল না। তোর মতো লেখাপড়া জানা ছেলে গাড়ির ড্রাইভার একথা কাউকে বলা যায়, বল!

সাদি বলল, বলো না কাউকে!

রুমি কথা বলল না। খানিক চুপ করে রইল, উদাস হয়ে রইল। তারপর বলল, এবার ফিরে গিয়ে গাড়ি চালাবার কাজটা যাতে আর না করতে হয় সেই ব্যবস্থা করব।

একটা ভাঁপাপিঠা ভেঙে তার ভেতর থেকে নারকেল আর গুড় বের করে বাচ্চাদের মতো করে খাচ্ছিল সাদি। খেতে খেতে বলল, কী করবি?

কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হব।

সেটা তো খরচের ব্যাপার?

হ্যাঁ ভাল খরচ।

খরচটা আসবে কোত্থেকে?

পার্টটাইম গাড়ি চালাব। এমনও হতে পারে সপ্তাহে তিনদিন গাড়ি চালাব তিনতিন কম্পিউটার কোর্স করব। একটা ভাল কোর্স করতে পারলে চাকরির অভাব নেই।

খালা বললেন, সেগুলো কি ভাল চাকরি?

রুমি একটা বোড়াপিঠা মুখে দিল। হ্যাঁ বেশ ভাল চাকরি।

তারপরই যেন রুমির খাওয়া খেয়াল করলেন খালা। মোটা কাচের চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন রুমির প্লেটের দিকে। কী খাচ্ছিস তুই?

রুমি অবাক হল। কেন পিঠা?

আরে বোকা আগে ছিটরুটি আর মুরগির মাংস খা। ওগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে। ঠান্ডা হয়ে গেলে খেতে ভাল লাগবে না।

ওগুলো খেলে পিঠা খাব কখন?

পরে খা।

এত খাব কী করে?

যতটা পারিস খা।

সাদি বলল, গত কয়েকদিন ধরে মা তো তোর জন্য শুধু পিঠাই বানিয়েছে। বহুরকমের পিঠা। তুই যতদিন দেশে আছিস সব পিঠা খেয়ে শেষ করতে পারবি না।

খালা ফোকলা মুখে হাসলেন। আরে না, অত কী আর বানিয়েছি না বানাতে পারি। এই বয়সে বসে বসে পিঠা বানানো যায় না।

রুমি বলল, কিন্তু তোমার আসল পিঠাটা কই খালা?

বিবিখানা?

হ্যাঁ।

করেছি। বিকেলবেলা দেব।

এই পিঠাটা নাকি বিক্রমপুর ছাড়া আর কোথাও হয় না।

সাদি বলল, হ্যাঁ। বিবিখানা পিঠা বিক্রমপুর ছাড়া আর কোথাও হয় না।

খালা বললেন, ও বাবা রুমি, একটা মুরব্বাও কিন্তু খাস বাবা। ছেলেবেলায় তুই খুব পছন্দ করতি।

রুমি হাসল। ছেলেবেলার দিন কি আর আছে খালা! এখন হচ্ছে বড়বেলা। তবু খাব! তুমি এত যত্ন করে, কষ্ট করে করেছ, যে কদিন আছি তুমি যা বলবে তাই করব।

একথা শুনে খালা কী রকম অভিমান করলেন। এসব কথা তোর মুখে মুখে। কাজে না।

রুমি অবাক হল। কাজে না মানে?

তুই কি এখন আর আমার কথা শুনিস?

তোমার কোন কথাটা আমি শুনিনি বল?

খেয়ে নে, তারপর বলি।

ব্যাপারটা বোধহয় সাদি বুঝল। আড়চোখে রুমির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিল। তবু রুমি বোধহয় বুঝল না কী বলতে চাচ্ছেন খালা। সাদির চোখ টেপা পাত্তা দিল না সে। ছেলেমানুষি গলায় খালাকে বলল, আস্তে আস্তে খাচ্ছি। খেতে সময় লাগবে। তুমি বল।

খালা আচমকা বললেন, তুই বিয়ে করছিস না কেন?

একথায় রুমি একেবারে থতমত খেয়ে গেল। প্রথমে খালার দিকে তারপর সাদির দিকে তাকাল। মুখে একটা কাটাপিঠার অর্ধেকটা, কিন্তু চিবাতে ভুলে গেল রুমি।

সাদি তখন মিটিমিটি হাসছে। আমি কিন্তু বুঝেছিলাম এই কথাটাই বলবেন মা। এজন্য চোখ টিপলাম তোকে।

রুমি পিঠা চিবাতে চিবাতে বলল, আমি বুঝতে পারিনি।

তা আমি বুঝেছি।

খালা গম্ভীর গলায় বললেন, আর বোঝাবুঝির কিছু নেই। এবার বিয়ে করতে হবে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তুই আর সাদি মাত্র কয়েক মাসের ছোটবড়। সাদির বাচ্চাকাচ্চা বড় হয়ে গেল আর তোর কোনও খবরই নেই।

রুমির দিকে তাকিয়ে সাদি বলল, মা কিন্তু ঘটকও লাগিয়েছেন।

খালা বললেন, হ্যাঁ লাগিয়েছি। খুব ভাল ঘরের, দেখতে সুন্দর, লেখাপড়া জানা চারটা মেয়ের খবর পেয়েছি। তুই নিজে মেয়ে দেখবি, যাকে পছন্দ হয় তাকে বিয়ে করবি।

তারপর কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন খালা। আমার যে দিন ফুরিয়ে আসছে আমি তা টের পাই। তোর খালু মারা গেলেন পনের বছর হয়ে গেল। যে কোনওদিন আমারও ডাক পড়বে। এই বয়সে পেছন ফিরে তাকিয়ে নিজের জীবনের একটা হিসেব কিতেব করে মানুষ। আমিও করি। তোকে নিয়ে আমার তিন ছেলেমেয়ের দুজনকে নিয়ে আমার কোনও চিন্তা ছিল না। বড় ভাল ঘরে বিয়ে দিলাম হাসির, শেষ পর্যন্ত ওর জীবনে ঘটল একটা দুর্ঘটনা। জামাই আবার বিয়ে করল। ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে, নানা দাদা হয়ে যাওয়ার পর এমন কাজ কেউ করে! টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব আছে তারপরও মেয়েটা আমার দুঃখি হয়ে গেছে। এই বয়সে এসে হাসির জন্য এমন দুঃখ পেতে হবে, কে ভেবেছে

বল? তোকে আর সাদিকে লেখাপড়া শেখলাম, তুই কেমন কেমন করে আমেরিকা চলে গেলি। সাদি ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে, বিয়ে শাদি করে যখন জীবন গুছাবে তখনই ব্যবসায় মার খেল। জীবনটা উল্টোপাল্টা হয়ে গেল ওর। এখন চাকরি বাকরি করে কষ্টের জীবন কাটায়। বিক্রমপুর থেকে ঢাকায় গিয়ে অফিস করে। বউটার মনে শান্তি নেই। বাচ্চা বড় হয়ে যাচ্ছে, গ্রামে ভাল স্কুল নেই, বাচ্চাই যদি মানুষ না হয় তাহলে কী অর্থ থাকে জীবনের! সবমিলে এই অবস্থাটার কথা খুব ভাবি আমি। তারপরও জীবন ওদের কেটে যাবেই। সবাই সবার পথ খুঁজে পাবে। জীবনের একটা পর্যায়ে তো হাসি এবং সাদি দুজনেই এসেছে। শুধু তোরই আসল জীবন শুরু করা হয়নি। আমি চাই সেই জীবনটা তুই শুরু কর।

মুরগির ঝোলে ছিটরুটি ভিজিয়ে খাচ্ছে রুমি এবং সাদি। হঠাৎ রুমি বলল, খালা তুমি নাশতা করেছ?

করেছি।

কী খেয়েছ?

আমি আটারুটি আর সবজি খাই। তুই জানিস না?

রুমি হাসল। ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও সেই অভ্যেসটা আছে?

আছে।

কাজ কর আগের মতো?

অতটা পারি না, তবে করি।

বই পড়?

সাদি বলল, তা পড়ে। বোধহয় আগের চেয়ে বেশি পড়ে।

খালা বললেন, নারে বাবা। আগের মতো পড়তে পারি না। চোখে খুব চাপ পড়ে।

তারপর তীক্ষ্ণচোখে রুমির মুখের দিকে তাকালেন খালা। কিন্তু কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছিস কেন?

রুমি হাসল। কোথায় কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছি?

করছিস। শোন, এবার তুই দেশে আসছিস, আবার কবে আসবি কে জানে, হয়তো এবারই শেষ দেখা তোর সঙ্গে আমার, হয়তো আর দেখা হবে না, আমার কথা তুই মন দিয়ে শোন।

খালার কথা শুনে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল রুমির। খেতে আর ইচ্ছে করল না। কাতর গলায় বলল, এভাবে বলো না খালা।

খালা হাসলেন। যা স্বাভাবিক তাই বলছি। তুই মন খারাপ করিস না। শোন, তুই বিয়েশাদি করে ঘরসংসার করছিস, সুখে শান্তিতে আছিস একটুকু জেনে যেতে পারলে আমার মনে হবে জীবনে আমার কোনও অপূর্ণতা রইল না। তোর সংসার দেখা হবে না আমার, কারণ তুই থাকবি বিদেশে, আমি আরেকদেশে। কিন্তু বুঝতে তো পারব। তুই ভাল আছিস শুনলেই আমার আত্মা শান্তি পাবে।

রুমির মাথায় সেই ছেলেবেলার মতো করে মায়াবি একখানা হাত রাখলেন খালা। বাবা, মরার আগে এইটুকু শান্তি তুই আমাকে দিস।

খালার কথা শুনে রুমির ইচ্ছে হল দুহাতে খালার হাতটা সে জড়িয়ে ধরে। আকুল গলায় বলে, তুমি যা বলবে আমি তাই করব খালা। তোমার কথার অবাধ্য আমি কখনও হব না।

কিন্তু রুমি তা করল না। বুকটা তোলপাড় করল তার, মনটা খারাপ হল, খুব কান্নাও পেল কিন্তু খালাকে সে বলতে পারল না, তুমি যা বলবে তাই করব আমি। বরং মনে মনে বলল, তোমার এই একটা কথাই আমি কখনও রাখতে পারব না খলা। তুমি আমাকে মাফ করো।

খালা বললেন, মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে। জীবন হচ্ছে লম্বা একটা পথ। কত বাঁক এই পথে। পথের বাঁকে বাঁকে কত ঘটনা ঘটে জীবনে, কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কত মানুষ মানুষের সঙ্গী হয় আবার কত মানুষ হারিয়ে যায়, হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কথা মনে রেখে জীবনের ওই পথচলা থামিয়ে দেয়া ঠিক না। তাহলে জীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

খালার কথার ভেতরকার অর্থটা রুমি বুঝল, কিন্তু ওই নিয়ে কোনও কথা বলল না। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল তার। চিলমচিতে হাত ধুয়ে বলল, জীবনভর বই পড়ে পড়ে এত জ্ঞানী তুমি হয়েছ খালা, দার্শনিকদের মতো কথা বল। আর বল এত সুন্দর করে, তোমার কথা শুনলে মন ভাল হয়ে যায়। শুনতে এত ভাল লাগে, মনে হয় দিনভর রাতভর শুধু তোমার কথা শুনি।

কিন্তু তুই কি ঠিক মতো খেয়েছিস?

খেয়েছি খালা।

তারপর সাদির দিকে তাকালেন তিনি। তোর পেট ভরেছে বাবা?

ভরেছে মা?

তাহলে রমিজকে বল চা দিতে।

তুমি খাবে?

হ্যাঁ।

দরজার দিকে তাকিয়ে রমিজকে ডাকল সাদি।

কাছাকাছিই ছিল রমিজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল। তাকে চায়ের কথা বলল সাদি।

রমিজ হেসে বলল, চা রেডিই আছে। আনতাছি।

রমিজ চলে যেতেই খালা বললেন, আরও কিছু কথা তোকে আমার বলা দরকার।

সাদি বলল, পরে বলো মা। আজ মাত্র এল আজই সব কথা বলে শেষ করে ফেলবে! কিছু কথা হাতে রাখ।

খালা হাসলেন। ঠিকই বলেছিস। কিছু কথা না হয় পরেই বলব। হাতে রেখে দিই।

রুমি তখন কী রকম আনমনা হয়ে আছে।

সন্ধেবেলা রমিজের ডাকে ঘুম ভাঙল।

দুপুরের খাওয়া বেশ আগেভাগেই হয়ে গিয়েছিল আজ। খেয়েই পুবের ঘরে এসে শুয়েছে রুমি এবং সাদি। রুমি কী রকম আনমনা হয়েছিল, আর সাদি আয়েসি ভঙ্গিতে সিগ্রেট টানছিল। মাথার কাছের জানালাটা খোলা। জানালার বাইরে নানারকমের গাছপালা। সেই সব গাছপালার ওপর পরিষ্কার আকাশ। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে রুমি, বুঝতে পারেনি।

এখন ঘুম ভেঙে দেখে তার পাশে শুয়ে সাদিও ঘুমোচ্ছে এবং জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে ঘরের ভেতর।

সন্ধেবেলা এরকম চাঁদের আলো!

আজ কি পূর্ণিমা!

জানালার বাইরে থেকে রমিজ বলল, কত ঘুমান? ওঠেন। রাইত হইয়া গেছে। দিনের ঘুম রাইতে ঘুমাইলে রাইতেরটা ঘুমাইবেন কখন?

সাদিকে আর ডাকতে হল না। রমিজের কথা শুনে এমনিতেই ঘুম ভাঙল তার। ঘরের ভেতর চাঁদের আলো দেখে ধরফর করে উঠে বসল সে। রাত হয়ে গেছে নাকি?

রুমি বলল, না, সন্ধ্যা।

তার মানে আজ পূর্ণিমা?

মনে হয়।

তারপর রমিজের দিকে তাকাল সাদি। চা দে।

রমিজ বলল, দুধচা না আঁদাচা।

রুমি বলল, এসময় আঁদাচা ভাল লাগবে না। দুধচা দে আর মুড়ি থাকলে দিবি।

রমিজ চলে যাওয়ার পর সাদি বলল, কালরাতের ঘুম পুষিয়ে ফেললি মনে হয়?

রুমি হাসল। তুই?

আমার পুরোপুরি পোষায়নি।

আমার পুষিয়েছে। দুতিনরাত জেগে থেকে মাত্র দুতিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে পুরোটা কাভার করতে পারি আমি।

তুই অনেক কিছুই পারিস।

রুমি আনমনা গলায় বলল, সত্যি অনেক কিছু পারি আমি।

তা জানি। শোন, আজ পূর্ণিমা। রাতে যতক্ষণ জেগে থাকব আমরা বাড়ির সামনের মাঠটায় গিয়ে বসে থাকব।

চাঁদের আলো দেখবি?

তা তো দেখবই। অবশ্য আর একটা উদ্দেশ্যও আছে। তোর কথা শোনা।

ওই যে বাবার কথা বলতে চাইলাম, ওসব কথা!

ওসব তো বলবিই, হয়তো আরও কিছু জানতে চাইব আমি।

কিন্তু রাতভর গল্প করলে কাল তুই অফিসে যাবি কেমন করে?

সাদি হাসল। তোর কি মনে হয় কাল আমি অফিসে যাব?

কেন না?

এতদিন পর তুই এলি আর তোকে বাড়িতে রেখে আমি অফিস করতে চলে যাব, প্রশ্নই ওঠে না।

দেখিস আমার জন্য আবার চাকরি বাকরি হারাস না।

হারালে হারাব। তোর জন্য চাকরি হারালে তুই আমাকে দেখবি। কী রে দেখবি না।

রুমি কথা বলার আগেই চা মুড়ি নিয়ে এল রমিজ। ওদের সামনে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

মুড়ি মুখে দিয়ে চায়ে চুমুক দিল রুমি। সাদির চাকরির প্রসঙ্গটা ভুলে গেল। হঠাৎই তার মনে পড়ল বড়পার কথা। সাদির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সাদি, বড়পার ব্যাপারটা খুলে বল তো আমাকে! মানে দুলাভাইর ব্যাপারটা। এই বয়সে এসে বিয়েটা তিনি কেন করলেন?

চা মুড়ি খেতে খেতে সাদি বলল, দুলাভাইর ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। এই বয়সে এসে, ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে সব দায়িত্ব শেষ করে হঠাৎ করে একটা লোক আবার বিয়ে করবে, ভাবলেই কেমন লাগে!

রুমি উদাস গলায় বলল, সব কিছুর মূলে মানুষের মন। মনের ভেতর কোথায় যে কী লুকিয়ে থাকে বোঝা মুশকিল। মন যে কখন কী করে, বোঝা মুশকিল।

যাকে বিয়ে করেছে তার অবস্থাও কিন্তু দুলাভাইর মতোই।

মানে?

সেই ভদ্রমহিলাও বিবাহিতা।

মানে আগের হাজব্যান্ডকে ডিভোর্স করে দুলাভাইকে বিয়ে করেছে?

না, হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর। বছরখানেক ক্যান্সারে ভুগেছেন ভদ্রলোক। তারপর মারা যান। দুটো মেয়ে আছে। ভাল জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েদের। বাচ্চাকাচ্চাও হয়ে গেছে তাদের। পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর বয়স হবে মহিলার।

দুলাভাইর সঙ্গে কি আগেই পরিচয় ছিল?

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সিগ্রেট ধরাল সাদি। আসল কাহিনীই এখানে। ছেলেবেলা থেকেই মহিলার সঙ্গে প্রেম ছিল দুলাভাইয়ের। মহিলাদের অবস্থা দুলাভাইদের চেয়ে ভাল ছিল বলে মহিলার গার্জিয়ানরা দুলাভাইর কাছে বিয়ে দেয়নি। অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায় তার।

কিন্তু প্রেমটা রয়ে যায়।

মনে হয়। তবে দীর্ঘকাল নাকি যোগাযোগ ছিল না। যোগাযোগটা হল ভদ মহিলার হাজব্যান্ডের অসুখের সময়।

কীভাবে?

দুলাভাই তার এক বন্ধুকে দেখতে হাসপাতালে গেছেন, ওই একই হাসপাতালে পাশাপাশি কেবিনে ভদ্রমহিলার হাজব্যান্ড ছিলেন। তারপর যা হয় আর কী, পুরনো প্রেম জাগা দিয়ে উঠল।

প্রেম নিয়ে শ্লেষটা ভাল লাগল না রুমির। বলল, এভাবে বলিস না। প্রেম নিয়ে শ্লেষ করাটা ঠিক নয়।

রুমির মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল সাদি। তারপর গভীর গলায় বলল, সরি। ভেরি সরি।

তারপর কী হল বল।

তারপর থেকে দুলাভাই নাকি প্রতিদিনই ভদ্রলোককে দেখতে হাসপাতালে যেতেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে, তার মেয়েদের সঙ্গে বেশ ভাল একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে যায়।

অর্থাৎ মহিলার গভীর বিপদের দিনে সত্যিকার বন্ধু হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন দুলাভাই!

রাইট। ভদ্রমহিলার অবস্থা ভাল। ঢাকায় পাঁচতলা দুটো বাড়ি। দুই মেয়েরও অবস্থা ভাল। চিকিৎসার খরচ টরচ চালাতে অসুবিধা হচ্ছিল না। তবু দুলাভাইও তাকে টাকা দিয়েছেন।

মানে যে কোনওভাবে হোক প্রেমিকার স্বামীকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

হ্যাঁ।

দ্যাটস গ্রেট। এই এটিচুডটা দারুণ লাগছে আমার। তারপর কী হল বল তো!

দাঁড়া একটা সিগেট ধরিয়ে নিই।

বেনসানের কার্টুন খুলেছিস?

হ্যাঁ। ওখানে থেকেই খাচ্ছি।

সিগ্রেট ধরিয়ে বড় করে টান দিল সাদি। তারপর বলল, হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা একেবারেই একা হয়ে যান। দুই মেয়ে যে যার সংসারে, দুলাভাই প্রায়ই তাকে সঙ্গ দিতে যান। কোনও কোনও রাতে বাড়ি ফেরেন না। তারপর একদিন শোনা গেল ভদ্রমহিলাকে তিনি বিয়ে করেছেন।

আপাকে না জানিয়ে?

হ্যাঁ।

কিন্তু এখন তো প্রথম স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে এভাবে বিয়ে করা যায় না!

দুলাভাই করেছেন।

বড়পা আইনের সাহায্য নেয়নি কেন?

আমি বলেছিলাম। শুনে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আইনের সাহায্য নিয়ে কী করব! মনের দিক থেকে যে মানুষ আমার কাছ থেকে সরে গেছে, আইন প্রয়োগ করে কি তার মন আমি ফেরাতে পারব! মনের সঙ্গে কি কোনও আইন চলে!

যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন স্বরে রুমি বলল, আচ্ছা শোন, বড়পার কোনও অর্থকষ্ট হচ্ছে না তো!

নানা ওসব সমস্যা নেই। ব্যবসা বাণিজ্য মিল কারখানা দোকানপাট সব তো বড়পার হাতে, তার ছেলেমেয়েদের হাতে। মাসে মাসে নিজের খরচের টাকাটা শুধু দুলাভাই নিচ্ছেন। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা উল্টো। এসব ক্ষেত্রে পুরুষমানুষগুলো বউবাচ্চার খরচ দেয়, দুলাভাইর ক্ষেত্রে বউবাচ্চারা তাঁর খরচ দিচ্ছে।

তিনি থাকেন কোথায়?

ভদ্রমহিলার বাড়িতে।

আপার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে?

টেলিফোনে বোধহয় কথাটথা হয়। আপার সামনে এসে দাঁড়াতে তাঁর নাকি খুব অপরাধবোধ হয়।

বিয়ের পর দুলাভাইর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

হয়েছে। অনেক কথা আমাকে তিনি একদিন বলেছেন। আমার বোনকে রেখে কেন আরেক জায়গায় তিনি বিয়ে করেছেন এই নিয়ে তাঁকে আমি চার্জ করেছিলাম। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর রুমি, দুলাভাইর কথা শুনে তাঁর ওপর আমি রাগ করতে পারিনি, আমার বরং অসাধারণ মনে হয়েছিল মানুষটাকে।

কী রকম?

আমাকে তিনি বললেন, অন্যায় আমি করেছি ঠিকই কিন্তু তেমন কোনও অসুবিধায় ফেলিনি কাউকে। ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর জীবন গুছিয়ে দিয়েছি। শুধু আমি ছাড়া আর সবই আছে তাদের। এক অর্থে আমিও আছি। যে কোনও বিপদে আপদে, ক্রাইসিসে আমি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেই। কিন্তু যাকে আমি বিয়ে করেছি আমি ছাড়া তার আসলে আর কেউ নেই। তাকে ভাল রাখার জন্যই কাজটা আমি করেছি। এক জীবনে আমরা দুজন পাগলের মতো দুজনকে চেয়েছিলাম। পাইনি। দুজনের জীবনের পথ দুদিকে ঘুরে গিয়েছিল। কিন্তু জীবন চক্রটা এমন, জীবনপথের অলিগলির তো কোনও শেষ নেই, একগলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজান্তেই পিছনে ফেলে আসা, পুরনো কোনও গলিতে এসে পড়তে পার তুমি, সেই গলির প্রিয় কোনও বাসিন্দার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেতে পারে, সব ভুলে সেই মানুষটার হাত তুমি আবার ধরতে পার, সব ভুলে তার সঙ্গেই কাটিয়ে দিতে পার বাকি জীবনটা। আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এরচে বেশি কি তোমাকে বলার দরকার আছে! তুমি শিক্ষিত ছেলে, নিশ্চয় আমার কথা বুঝতে পারছ। শিরিনের সঙ্গে ওই হাসপাতালে দেখা হওয়া মানে জীবনের পুরনো গলিতে ফিরে গিয়েছিলাম আমি।

ভদ্রমহিলার নাম শিরিন?

হ্যাঁ। শিরিন আখতার।

দুলাভাইর কথা শুনে আশ্চর্য লাগছে আমার। এত গভীর চিন্তা ভাবনার মানুষ তিনি তাঁকে দেখে একথা আমার কখনও মনে হয়নি। আমার বরং তাঁকে নির্বোধ এবং অশিক্ষিত কাপড়ের ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছুই কখনও মনে হয়নি।

বাইরে থেকে দেখে মানুষের অনেক কিছুই আসলে বোঝা যায় না। মনের ভেতর যে কত রহস্যময়তা মানুষের, কত জটিলতা! শেষ পর্যন্ত দুলাভাই আমাকে বললেন, এক জীবনে আমি আসলে দুটো জীবন কাটিয়ে যেতে চাই। একদিন যাকে পেতে চেয়েছি, যার সঙ্গে সমগ্র জীবন কাটাতে চেয়েছি, যখন জীবনের টানে সে চলে গেল একদিকে, আমি চলে গেলাম আরেক দিকে, দুজনেরই জীবন জড়িয়ে গেল অন্য মানুষের সঙ্গে, জীবনের অনেকখানি ফুরিয়ে আসার পর আবার যখন পুরনো মানুষ দুটো আমরা একসঙ্গে হলাম, সেই সময়কার জীবনটা কাটাবার স্বপ্ন আবার আমাদের চোখে এসে ভর করল। একবার যে জীবন চেয়ে পাইনি, দ্বিতীয়বার পেয়ে সেই জীবন হারাবার সাহস আমার হয়নি। সেই জীবনটাকেই আমি আঁকড়ে ধরেছি।

রুমি মুগ্ধ গলায় বলল, জীবন সম্পর্কে অসাধারণ ব্যাখ্যা। ফিলোসফারদের মতো। আসলে প্রত্যেক মানুষের ভেতরই একজন ফিলোসফার বাস করে। তবে দুলাভাইর ওপর এখন আর আমার কোনও রাগ নেই সাদি। তোর কথা শুনে মনে হল তিনি কোনও অপরাধ করেননি।

আমারও তাই মনে হয়েছিল। বোধহয় এজন্যই বড়পা দুলাভাই, দুলাভাইর বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে তোকে কিছু বলা হয়নি। যদি দুলাভাইকে অপরাধী মনে হতো তাহলে নিশ্চয় বলে ফেলতাম, নিজের অজান্তেই হয়তো বলে ফেলতাম।

তারপর বিছানা থেকে থামল সাদি। চল মাঠে গিয়ে বসি। ফাগুন হাওয়া আর চাঁদেরা আলো, রবীন্দ্রনাথের গানের মতো মনে হবে সবকিছু। 'ফাগুন হওয়ায় হাওয়ায় করেছ যে দান'।

মাঠে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল রুমি।

চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো হয়ে আছে মাঠখানি। পেছনে গাছপালার ছায়া, সামনে ঢালাও চাঁদের আলো, ফাগুনের হাওয়া হু হু করে বইছে। সবমিলে অপূর্ব পরিবেশ।

রুমি বলল, সত্যি বাংলাদেশের সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না। কতদিন পর এরকম এক সৌন্দর্যের সঙ্গে দেখা হল! এরকম চাঁদের আলো মাঠ হাওয়া কতদিন দেখিনি।

সাদি ততোক্ষণে মাঠের ঘাসে আধশোয়া হয়েছে। কখন একটা সিগ্রেটও ধরিয়েছে। রুমি তার পাশে বসল। নিজের অজান্তেই যেন চোখ চলে গেল মিয়াদের বাগানবাড়ির পাশের রাস্তায়। রাস্তাটি যেন অবিকল তেমনই আছে। ওই তো সেদিন বাবা বেরিয়ে আসার আগেই পথটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল রুমি। জীবনে প্রথম নিভৃতে বাবার সঙ্গে কথা হলো।

রুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সাদি বলল, কী হল? পুরনো কথা কিছু মনে পড়ল?

হ্যাঁ বাবার কথা। মিয়াবাড়ির রাস্তায় বাবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

সাদি সিগ্রেট টান দিল। তাই তো। ঘটনাটা তো আর বললি না; এখন বল। সব খুলে বল।

আসলে খালা তো খুব শ্লেষ করছিলেন বাবাকে, দুএকবার আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বসেছিলেন বাবা। বুঝতে পারছিলাম খুব লজ্জা পাচ্ছেন। যে কারণে এতদিন পর এই বাড়িতে এসেছেন, মানে আমার সঙ্গে দেখা করা সেটা বলতে পারছেন না এমনিতেই তাঁর জন্য আমার মায়া লাগছিল, তার ওপর কী বলতে এতদিন পর এলেন খুব জানতে ইচ্ছে করছিল। এজন্যই ওই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিকে হেঁটে আসছিলেন বাবা, আমাকে দেখে মুখে যে কী অসাধারণ এক হাসি ফুটে উঠল তাঁর। সেই হাসিটা খুব ভাল

লাগল আমার। বাবা বললেন, এখানে এসে খুব ভাল করেছ। বাড়িতে তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই হচ্ছিল না। অথচ আমি এসেছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলতেই। তোমার এক মামা আছেন মোশাররফ, তাঁর সঙ্গে কদিন আগে গুলিস্তানে দেখা হয়েছিল, কথায় কথায় বললেন তুমি আমেরিকায় যাচ্ছ, শুনে ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু দেখা করি। কারণ, শুনে মনটা খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। এক সময় আমার নিজের খুব স্বপ্ন ছিল জীবনটা আমি আমেরিকায় কাটাব। তা তো আর হয়নি। খোকনকে হয়তো পাঠাতে চেষ্টা করব। দেখা যাক কখনও যদি সেটা হয় তো হবে। আর এখন না হলেও কোনও অসুবিধা নেই। মনে কোনও দুঃখ থাকবে না আমার। আমার এক ছেলে তো যাচ্ছে! আমার নিজের স্বপ্ন আমার ছেলে পূরণ করছে।

রুমির কথা শুনে উঠে বসল সাদি। সিগ্রেটে পর পর দুটো টান দিয়ে বলল, শুধুমাত্র এজন্যই তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন?

হ্যাঁ, অন্যকোনও কারণে নয়।

বলিস কী? আমি তো ভেবেছি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে!

না। শুধুই আমাকে এইটুকু জানাতে যে তার একটা স্বপ্ন আমি পূরণ করছে। যাচ্ছি তিনি জানতেন এই বাড়িতে এলে খুবই অসস্তিকর পরিস্থিতিতে তাঁকে পড়তে হবে। অনেক অপ্রিয় কথা শুনতে হবে। তবু তিনি এসেছিলেন।

এবং সত্যি সত্যি মা তাকে অনেক কথা শোনালেন।

এসব শুনবেন জেনেও তিনি এসেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি জানিস, তিনি আমাকে বললেন, তোমার খালার কথা শুনে আমি কিছু মনে করিনি। এটা আমার প্রাপ্য। প্রাপ্যটা আমার পাওয়া উচিত। আসলেই আমার অপরাধের কোনও সীমা পরিসীমা নেই। যে সন্তানকে ওভাবে একদিন ফেলে গেছি, কখনও কোনও খোঁজখবর নিইনি, এতকাল পর তার কাছে এসেছি শুধু আমার ভাল লাগার কথা জানাতে, তার চারপাশের মানুষরা আমাকে ছাড়বে কেন? তোমার খালা যা করেছেন ঠিকই করেছেন। তিনি কী বলেছেন না বলেছেন আমার মনেই নেই। কারণ তোমার আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারে যে ভাল লাগত আমার অবশ্য ভেতর তৈরি হয়েছে সেই ভাল লাগার কাছে অন্য সবকিছু তুচ্ছ। বললাম, কিন্তু আপনিআপনার ভাল লাগার কথা আমাকে না জানিয়েই চলে যাচ্ছিলেন। না তা যাচ্ছিলাম না, আমি আসলে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে রমিজ নামের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার কথা, বলল তুমি নাকি এদিকে এসেছ।

আশ্চর্য লাগছে শুনে। সত্যি মানুষের মনের ভেতরটা অদ্ভুত সব রহস্যময়তায় ভরা। গভীর এক ভাললাগার কথা বলতে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বাবা। মানুষ কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করবে না। যত ভাবেই বলিস, কেউ বিশ্বাস করবে না।

তা ঠিক। শেষ পর্যন্ত বাবা আমাকে বললেন, জানি তোমার ব্যাপারে অপরাধের সীমা পরিসীমা নেই আমার। ওসব নিয়ে কথা বলে আমি তা কাটাতেও পারব না। সুতরাং বলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, অপরিসীম কৃতজ্ঞ। সম্ভব হলে তোমার আমেরিকার ঠিকানাটা আমাকে দাও। মানে প্রথমে গিয়ে যেখানে উঠবে সেখানকার ঠিকানা। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে চিঠি লিখব। জীবনের কথাগুলো তোমাকে জানাব।

একটু থামল রুমি। তারপর বলল, ওসব জানাবার জন্যই তিনি আমাকে চিঠি লেখেন।

তার মানে তোর বাবার জীবনের সব ঘটনা তুই জেনেছিস?

হ্যাঁ তিনি আমাকে সবই লেখেন। সবমিলে মানুষটির মধ্যে কোথায় যেন গভীর এক অসহায়ত্ব আছে। আমাকে এভাবে ভুলে থাকা বা ছেড়ে থাকা যাই বলিস তার মধ্যেও নিশ্চয় গভীর কোনও অসহায়ত্ব কাজ করেছে। মানুষের প্রতিটি আচরণেরই কোনও না কোনও কারণ থাকে। সেই কারণটা জানা হয়ে গেলে মানুষের বেশির ভাগ অপরাধই ক্ষমা করে দেয়া যায়।

সাদি তারপর আচমকা বলল, রুমি, এতদিন পর কী মনে করে দেশে ফিরলি তুই?

রুমি চমকাল। সাদির চোখের দিকে তাকাল। কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেল না তার চোখ। চাঁদের দিকে পেছন ফিরে বসেছে। ফলে চোখের কাছে ছায়া পড়েছে সাদির।

কিন্তু সাদির প্রশ্নে বেশ ধাক্কা খেয়েছে সে। সেই ধাক্কা সামলে সরল গলায় বলল, তোদের জন্য এসেছি।

শুধুই কি আমাদের জন্য?

তোর কী মনে হয়?

মনে হয় আমরাই একমাত্র কারণ নই।

রুমি অন্যমনস্ক হল। হতে পারে।

যদি কোনও অসুবিধা না থাকে অন্য কারণগুলো আমাকে বল।

একটা কারণ হচ্ছে বাবার সঙ্গে দেখা করা। তাঁর শরীরের যা অবস্থা হয়তো এবারের দেখাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে। বাবার দ্বিতীয় স্ত্রীকেও আমি একটু দেখতে চাই। কেমন করে আমার বাবাকে তিনি আগলে রাখেন, দেখতে চাই। আমার ভাইটাকে দেখতে চাই, খোকন। তিন বোনের একজনকে আমি দেখেছি, আশা। বাকি দুজনকে দেখতে চাই। নিশা, দিশা।

আশাকে তুই কোথায় দেখেছিস?

টোরেন্টোতে। আমি আশার ওখানে গিয়েছিলাম।

সাদি খুবই অবাক হল। তাই নাকি! যোগাযোগ হল কী করে?

আশার কথা বাবা আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন। একবার ফোন নাম্বার দিলেন। আশাকে আমি ফোন করলাম। তুই বিশ্বাস কর সাদি, আমার ফোন পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল আশা। কী যে উচ্ছ্বাস, কী যে আবেগ! কান্নাকাটি করতে লাগল ফোনে। বাবাকে অভিযুক্ত করল বারবার। আর আমাকে এমন অনুরোধ করল ওর ওখানে যাওয়ার! আমার ফোন নাম্বার নিল। তারপর থেকে প্রায়ই আমাকে ফোন করে। মায়ের পেটের ছোটবোন যেভাবে প্রবাসী ভাইয়ের খোঁজখবর নেয় ঠিক সেইভাবে আমার খোঁজখবর করে। একদিন ওর আর ওর হাজব্যান্ডের অনেকগুলো ছবি পাঠাল আমাকে। হাজব্যান্ডের সঙ্গে ফোনে পরিচয় করিয়ে দিল। ছেলেটার নাম মামুন। খুব ভাল ছেলে। ফোনে কথা বলতে বলতে কখন যে আশাকে আমি তুই করে বলতে লাগলাম, আশা আমাকে তুমি করে বলতে শুরু করল টেরই পেলাম না। আশার আবেগ উচ্ছ্বাস মান অভিমান সব এত ভাল লাগতে শুরু করল আমার, ছোটবোনের মায়ামমতার স্বাদ আমার জীবনে ছিল না। বড়পার কাছ থেকে বড়বোনের আদরটা আমি পেয়েছি, আশার কাছ থেকে ছোটবোনেরটা পেলাম। গেলাম টোরেন্টোতে। পাঁচদিন ছিলাম। সেই পাঁচটা দিন কী যে করেছে আশা আমার জন্য! এরচে বেশি মমতা কোনও বোন তার ভাইয়ের জন্য দেখাতে পারে বলে আমার মনে হয় না। চলে আসার দিন আমাকে জড়িয়ে ধরে যে কী কান্নাটা কাঁদল! আশাকে দেখে আমি বুঝে গেছি আমার ভাইবোনগুলো নরম মনের। ওদেরকে আমার ভাল লাগবে। সম্পর্কটা ওদের সঙ্গে আমি তৈরি করতে চাই। একজীবনে আমারও হোক না দুটো জীবন! একদিকে তোরা, আরেক দিকে ওরা।

সাদি চুপ করে রইল।

রুমি বলল, বাবাকে নিয়ে অন্য একটা চিন্তাও আমার আছে। যে স্বপ্ন নিজেকে নিয়ে বাবা একদিন দেখেছিলেন, আমেরিকায় যাওয়ার, সেখানে জীবন কাটাবার, তাঁর সেই সাধ আমি পূরণ করে দিতে পারি কী না দেখব।

সাদি বলল, তার মানে তাঁকে তুই আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাস?

হ্যাঁ। আমি যেহেতু আমেরিকার সিটিজেন, চাইলে ট্রিটম্যান্টের জন্য আমার বাবাকে আমি নিয়ে যেতে পারি। চার ছেলেমেয়ের কাছে জীবনের অনেকগুলো দিন তিনি কাটিয়েছেন, কিছুটা দিন আমার কাছেও কাটালেন তাঁর স্বপ্নের দেশে।

একটু থামল রুমি। তারপর বলল, এইসব প্ল্যান নিয়েই আসা। কিন্তু দেশে এসে তোর অবস্থা দেখে, তিথির সঙ্গে খালার সম্পর্কের কথা জেনে, সংসারের অশান্তির কথা শুনে তোকে নিয়েও খুব ভাবছি।

সাদি হাসল। আমাকেও আমেরিকায় নিয়ে যাবি নাকি!

তাতো আর চাইলেই পারব না। দেখি অন্যকিছু করে দেয়া যায় নাকি তোকে। কাপড়ের বিজনেসটা কি ইচ্ছে করলে তুই আবার করতে পারিস?

তা পারি। কিন্তু ইসলামপুরের আর সেই অসস্থা নেই। বিজনেস নষ্ট হয়ে গেছে।

তাহলে কী ধরনের বিজনেস করতে পারিস তুই?

সবচে ভাল হয় ঢাকার কোনও একটা চালু মার্কেটে যদি একটা দোকান টোকান নেয়া যায়।

কী ধরনের দোকান?

রেডিমেড গার্মেন্টসের ফ্যাশনেবল দোকান। ওই ধরনের দোকানের বিজনেস একাধারে দুটো। বেচাকেনার বিজনেস আর যতদিন যাবে দোকানের ভ্যালু তত বাড়তে থাকবে। ওরকম একটা দোকান হলে আর কিছু লাগে না। রাজার হালে জীবন কাটানো যায়।

কতটাকা লাগে ওরকম একটা দোকান করতে!

পনেরো টনেরোর কম না।

অনেক টাকা!

সাদি চুপ করে রইল।

রুমি বলল, তুই দোকান দেখ।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না সাদি। বলল, কী করব?

দোকান খুঁজে বের কর। মাসদেড়েক আছি আমি এর মধ্যে ভাল দোকান পেয়ে গেলে আমি তোকে করে দেব। আপাতত কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। দোকান খোঁজ।

কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার তো!

ওসব তোর ভাববার দরকার নেই। টাকা তোকে আমি দেব। তুই শুধু আমার একটা কাজ করে দিবি।

কী কাজ?

আমি একটু মিলির সঙ্গে দেখা করতে চাই। ব্যবস্থাটা তোকে করতে হবে। এতক্ষণ ধরে দেশে আসার যেসব কারণ তোকে আমি বলেছি সেসব আসলে প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ মিলি। আমি দেশে এসেছি মিলির জন্য।

কিন্তু মিলি এখন আরেকজনের স্ত্রী, দুটো ছেলেমেয়ের মা। মেয়েটা বড়, সে ক্লাশ ফাইভে পড়ে। ছেলেটা ক্লাশ টুতে।

আরেকজনের স্ত্রী কিংবা ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে দেখা করা যায় না?

তা যাবে না কেন?

তাছাড়া মিলি তোর ফুফাতো বোন। তুই চাইলে ব্যবস্থা করা কি খুব কঠিন?

না তা নয়, ব্যবস্থা আমি করতে পারব। কিন্তু এতদিন পর তার সঙ্গে দেখা করার দরকার কী! লাভটাই বা কী? বুঝলাম তোর সঙ্গে এক সময় গভীর সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক তো....।

সাদিরা কথা শেষ হওয়ার আগেই রুমি বলল, শুধু গভীর সম্পর্কই না, তারচে বেশি কিছু।

একটু থামল রুমি তারপর ধীরশান্ত গলায় বলল, মিলির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ করে যেন সিগ্রেটের ছ্যাকা লাগল হাতে এমন করে চমকাল সাদি। কী, কী বললি! বিয়ে হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, আমার জীবনের এই একটি ঘটনাই তুই জানিস না। তোর কাছে আমি লুকিয়ে গেছি। এ জন্য অবশ্য মিলি দায়ি। সে চায়নি বিয়ের সময় তুই থাক বা ব্যাপারটা তুই জানিস! আমাকে বলেছিল চারবছর সময় তোমাকে আমি দিচ্ছি। চারবছরে আমেরিকায় সবকিছু গোছাবে তুমি। তারপর ফিরে এলে নতুন করে বিয়ে হবে আমাদের এবং আমি তোমার সঙ্গে আমেরিকায় চলে যাব। আমাদের এই গোপন বিয়ের কথা আমরা কখনও কাউকে জানাব না। অর্থাৎ জানাবার দরকারই হবে না।

জানাবার দরকার না হলে এই বিয়ে কেন করল সে?

অন্য জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা হলে সেই বিয়ে সে যেন আটকাতে পারে!

কিন্তু এমন চেষ্টা মিলি করেনি। করলে আমার কানে আসতো। তোর সঙ্গে মিলির সম্পর্কের কথা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা প্রায় সবাই জানত। এত ভাল ছেলে তুই, এত ব্রিলিয়ান্ট তারপরও তোর সঙ্গে মিলিকে বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না ফুফা ফুফু দুজনেই। কারণ তোর প্রকৃত অর্থে কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। ফুফা

দুএকবার এমন বলেছেনও আমার মেয়ে আমি অমন চালচুলোহীনের কাছে বিয়ে দেব না। দরকার হলে চিরকাল আইবুড়ো থাকবে মেয়ে, তবুও না।

এসব আমি জানতাম। মিলিও জানতো। এজন্য বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল সে নিজেই। গেন্ডারিয়ায় ওর খালাতো বোন থাকে, আকতার আপা, সেই আপা দুলাভাইকে ম্যানেজ করে, তাদের ফ্ল্যাটে কাজী ডেকে এনে বিয়ে হয়েছিল আমাদের। আপা দুলাভাইই ব্যবস্থা করেছিলেন। দুলাভাইয়ের দুজন বন্ধু সাক্ষী হয়েছিল আমার পক্ষে, আর মিলির পক্ষে আপা দুলাভাই দুজন।

কিন্তু মিলি এসব চেপে গেল কেন? এভাবে বিয়েই বা করল কেন, চেপেই বা গেল কেন?

ঠিক এই দুটো প্রশ্নই মিলিকে আমি করতে চাই।

আর তুই আমেরিকায় যাওয়ার দেড় বছরের মধ্যেই তো বিয়ে হয়ে গেল ওর!

রুমি চুপ করে রইল।

সাদি বলল, তুই চলে যাওয়ার পর কতদিন মিলি তোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে?

চৌদ্দ পনের মাস। তারপর হঠাৎ করেই চিঠিপত্র বন্ধ হয়ে যায়।

তুই চিঠি লিখতি কোন ঠিকানায়?

আকতার আপার বাসার ঠিকানায়।

মিলির চিঠি বন্ধ হওয়ার পর কী করলি?

ক্রমাগত চিঠি লিখে গেছি। উত্তর না পেয়ে তোকে লিখলাম মিলির খোঁজ খবর নিতে। তুই জানালি মিলির বিয়ে হয়ে গেছে।

তারপর এতগুলো বছর সে আর কোনও যোগাযোগ তোর সাথে করেনি?

না।

বিয়ের কাগজপত্রগুলো কার কাছে?

মূলগুলো আমার কাছে। মিলির কাছে আছে ফটোকপি।

কিন্তু এই নিয়ে তুই তো কোনও কথা বলিসনি! সে তোর লিগ্যাল ওয়াইফ। অন্য জায়গায় সে বিয়ে করে কী করে?

একথা আমিও ভেবেছি। ভেবে কোনও কূলকিনারা পাইনি। আমার মনে হয়েছে এক্ষেত্রে কারও কোনও দোষ নেই। সব দোষ মিলির। গার্জিয়ানরা যখন বিয়ে ঠিক করছে সেই সময় মিলি যদি তাদেরকে বলতো আমার বিয়ে হয়ে গেছে, এই যে কাগজপত্র, তাহলে নিশ্চয় গার্জিয়ানরা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেন।

তাই তো! তাছাড়া যার সঙ্গে মিলির বিয়ে হয়েছে, ছেলেটার নাম সেলিম, আমি তো শুনেছি বিয়ের আগেই মিলির সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গিয়েছিল।

রুমি অবাক হল। তাই নাকি?

হ্যাঁ। শুনে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। কেমন মেয়ে মিলি! তার সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক, গভীর প্রেম, সেই তুই বিদেশে যেতে না যেতেই আরেকজনের সঙ্গে ঢলাঢলি শুরু করল সে? হোক আমার ফুফাতো বোন, ওসব শুনে মিলিকে আমি খারাপ মেয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম।

এমন হতে পারে। প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা চোখের আড়ালে চলে গেলে চট করে বদলে যেতে পারে কোনও কোনও মানুষ। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে এমন ঘটলে একমাত্র সমাধান হচ্ছে ডিভোর্স। মিলির ক্ষেত্রে অমন যদি হয়ে থাকে তাহলে ওই দুলাভাইকে ধরে গোপনে সে আমাকে ডিভোর্স করবে তারপর অন্যজনকে বিয়ে করবে! একসঙ্গে দুজনের স্ত্রী সে থাকতে পারে না।

তাই তো! আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

সাদির একটা হাত ধরল রুমি। তুই আমাকে হেলপ কর। মিলির সঙ্গে দেখা করে আমি এসব জানতে চাই। সে এখনও আমার স্ত্রী। আইনের একটা বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি আমরা দুজন। এই বন্ধনটা আমি কাটাতে চাই।

সাদি বলল, তুই চিন্তা করিস না। যেমন করে পারি ব্যবস্থা আমি করব।

মিলি, তুমি আমার সঙ্গে এমন করেছিলে কেন?

মিলি অপলক চোখে তাকিয়ে আছে রুমির দিকে। চোখে পলক পড়ছে না তার, অথবা চোখে পলক ফেলতে যেন ভুলে গেছে সে।

ওরা বসে আছে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে।

মিলি বলেছিল ঠিক সাড়ে বারোটায় আসবে। মগবাজারের এই রেস্টুরেন্টের নামও তার বলা।

শুনে চমকে উঠেছিল রুমি।

এই রেস্টুরেন্টটা অনেক কালের পুরনো। সেইসব ভালবাসার দিনে তিন চারবার মিলিকে নিয়ে এই রেস্টুরেন্টে এসেছে রুমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখোমুখি বসে থেকেছে। টুকটাক কত কথা, কত স্বপ্ন দেখা। একটুখানি হাত ধরা আর সেই স্পর্শে শরীরের অভ্যন্তরে আগুন ধরে যাওয়া।

মিলির নিশ্চয় তা মনে আছে। নয়তো এত রেস্টুরেন্ট থাকতে দেখা করার জন্য এই রেস্টুরেন্টের নাম কেন বলল সে!

পনের মিনিট আগেই চলে এসেছিল রুমি। সোয়া বারোটায় এসে রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। ঢুকে নিজের অজান্তেই যেন তাদের সেই পুরনো টেবিলটায় এসে বসেছে।

অবশ্য রেস্টুরেন্টের ভেতরটা অনেক বদলেছে। ইনটেরিয়ার ডেকোরেশান নতুন করে করা। তবু যেদিকটায় আগে ওরা বসেছে, ভেতরে ঢুকে সেই দিকটা চিনতে পেরেছে রুমি। নিজের অজান্তেই যেন চলে এসেছে ওই টেবিলে।

মিলিও নিশ্চয় রুমির মতোই করবে। নিজের অজান্তেই চলে আসবে এই টেবিলে!

তাছাড়া রেস্টুরেন্টটা একেবারেই ফাঁকা। লোকজন বলতে গেলে নেই। পুরনো স্মৃতি মনে না থাকলেও রুমিকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না মিলির।

রেস্টুরেন্টের ফাঁকা অবস্থাটা ভাল লাগল রুমির। ভাল জায়গা পছন্দ করেছে মিলি। যতক্ষণ ইচ্ছা নির্জনে বসে কথা বলা যাবে।

সেই রাতে কথা হওয়ার পাঁচদিনের মাথায় মিলির সঙ্গে রুমির দেখা করার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল সাদি। মিলির শ্বশুরবাড়ি রামপুরায়। সেই বাড়ির ফোন নাম্বার জানা ছিল না সাদির। মিলির ছোটভাই কবিরের কাছ থেকে নিয়েছিল। নিয়ে ফোন করেছে।

সাদির ফোন পেয়ে অবাক হয়েছিল মিলি। বহুকাল সাদির সঙ্গে তার দেখা হয় না, যোগাযোগ বলতে গেলে নেই।

সাদির মেজোফুফুর মেয়ে মিলি। আগাগোড়াই ঢাকায় থাকেন এই ফুফু। বড়ফুফু থাকেন গ্রামে। সাদির সেই পুতুলের মা। ছোট ফুফুও ঢাকায়। দুই চাচা সাদির। চাচারাও ঢাকায়। ভাইবোনের মধ্যে সবার বড় সাদির বাবা। জীবনটা তিনি গ্রামেই কাটিয়ে গেছেন।

মিলি বরাবরই একটু উচ্ছল স্বভাবের মেয়ে। বিয়ে হয়েছে অনেকদিন, বাচ্চাকাচ্চার মা হয়ে গেছে তবু উচ্ছলতা কমেনি তার। সাদির মুখে রুমির কথা শুনে লাফিয়ে উঠল। তাই নাকি! দেশে ফিরেছে! এতদিন পর কী মনে করে ফিরল?

সাদি গম্ভীর গলায় বলেছিল, সেকথা তুই জিজ্ঞেস করিস।

মিলি তার স্বভাব সুলভ উচ্ছল গলায় বলেছিল, আমি তাকে পাব কোথায় যে জিজ্ঞেস করব! সে আছে কোথায়?

আমাদের ওখানে।

ঢাকায় আসবে না?

নিশ্চয় আসবে।

মিলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি তার সঙ্গে দেখা করব।

শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল সাদি। তাই নাকি! দেখা করবি তুই?

অবশ্যই করব। তার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তুমি তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আস।

কিন্তু তুই তো শ্বশুরবাড়িতে। ওই বাড়িতে যাওয়া কি তার ঠিক হবে!

কেন ঠিক হবে না!

আমার মনে হয় রুমি যেতে চাইবে না।

তাহলে আমাদের ওই বাড়িতে, মানে তোমার মেজোফুফুর বাড়িতে...।

তারচে অন্য কোথাও দেখা কর তোরা। আমি আসলে এজন্যই তোকে ফোন করেছি। রুমি তোর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। কী কী সব জরুরি কথা আছে।

তাহলে তুমিই বল কোথায় দেখা হতে পারে!

তোর সুবিধে মতো বল। বাচ্চাকাচ্চা সংসার সামলে আসতে হবে। কোথায় আসবি তুই ঠিক কর।

মিলি বলেছিল, সংসার নিয়ে আমার কোনও ঝামেলা নেই। ওসব সামলান আমার শাশুড়ি। আমার ঝামেলা একটাই, ছেলেমেয়ের স্কুল। সকাল সাড়ে সাতটায় স্কুলে পৌঁছে দিতে হয়, আনতে হয় সাড়ে এগারোটায়।

তাহলে বাচ্চাদের যেদিন স্কুল নেই সেদিন কর।

না না সেদিন অন্য ঝামেলা থাকে।

তারপর এইভাবে দেখা করার প্ল্যান করেছিল মিলি। রেস্টুরেন্টের নাম এবং সময় বলেছিল। শুনে সাদি বলেছিল, আমার কাজটা তুই করে দিলি।

কথাটা বুঝতে পারেনি মিলি। বলেছিল, মানে?

আমি তোকে আজ ফোন করেছি রুমির জন্য। রুমি তোর সঙ্গে দেখা করতে চায় একথা বলার জন্য। তুই দেখা করবি কী না বুঝতে পারিনি, কিন্তু রুমি আমাকে এমন করে ধরেছে....।

সাদির কথা শেষ হওয়ার আগেই মিলি বলেছিল, তুমি যখন ওর কথা বলেছ, ও দেশে এসেছে, শুনেই তোমার ফোন করার উদ্দেশ্যটা আমি বুঝেছি। আমিও চাই ওর সঙ্গে আমার দেখা হোক।

মিলি এল বারোটা পঁয়ত্রিশে।

আকাশি রংয়ের সুন্দর শাড়ি পরা মিলিকে দেখে মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল রুমি। মিলি যেন সেই আগের মতোই আছে।

মিলিও তাকিয়ে আছে রুমির দিকে। রেস্টুরেন্টে ঢুকে কখন এসেছে এই টেবিলের সামনে, কখন রুমির মুখোমুখি বসেছে, কখন থেকে এইভাবে তাকিয়ে আছে মিলির যেন সেকথা মনেই নেই।

ঠিক তখুনি রুমি মনে মনে বলল, মিলি, তুমি আমার সঙ্গে এমন করেছিলে কেন?

এই রেস্টুরেন্টে লোকজন তেমন আসে না দেখে ওয়েটারগুলোর কোনও কাজ থাকে না। দুএকজন কেউ এলে তারা খুব ব্যস্ত হয়। রুমি এবং মিলিকে দেখেও হয়েছে। অর্ডার নেয়ার জন্য স্লিপপ্যাড আর কলম নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের টেবিলের সামনে। অর্ডার দেবেন?

ওয়েটারের কথায় চোখে পলক পড়েছিল ওদের।

রুমি কথা বলবার আগেই মিলি বলল, খাবারের অর্ডার পরে দেব। আপাতত সফট ড্রিংকস। কোক।

তারপর আবার তাকাল রুমির দিকে। কতদিন পর দেখা হল বল তো?

রুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনেকদিন। প্রায় চৌদ্দ বছর।

হ্যাঁ অনেকগুলো দিন। কী রকম চোখের পলকে চলে গেছে সময়টা।

সময় তো এভাবেই যায়। মানুষ টের পায় না, সময় তার মতো যেতে থাকে।

তবে মানুষকে বদলে দিতে দিতে যায়। তোমাকে অনেক বদলে দিয়েছে সময়।

তোমাকে বদলায়নি?

নিশ্চয় বদলেছে।

তুমি বদলেছ বেশি।

মেয়েদের বদলানোটা অবশ্য চোখে পড়ে বেশি। বিয়ে হলে চট করেই বদলে যায় তারা। স্বামী সংসার বাচ্চাকাচ্চা। বিয়ে হলে চট করে শরীরেরও একটা বদল ঘটে মেয়েদের।

তোমার তেমন ঘটেনি।

মানে?

খুব একটা বদলাওনি তুমি।

কে বলেছে বদলাইনি! কত মোটা হয়েছি আমি। কত চুল পেকে গেছে।

তাই নাকি! চুল পেকে গেছে তোমার?

হ্যাঁ অনেক।

কই বোঝা যায় না তো!

কালার করে রেখেছি দেখতে পাচ্ছ না?

তা পাচ্ছি।

চুল পেকেছে বলেই তো এমন করেছি।

মিলির কথা বলার ভঙ্গিতে অবাক হচ্ছিল রুমি। এত সহজ সরল এবং উচ্ছল ভঙ্গিতে কেমন করে কথা বলছে সে! কোথাও কোনও দ্বিধা নেই, অপরাধ বোধ নেই। একদা যার সঙ্গে গভীর প্রেম ছিল, গোপনে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, সেই বিয়ে রয়ে যাওয়ার পরও আরেকজনকে বিয়ে করেছে সে, সংসার করছে, বাচ্চাকাচ্চা সামলাচ্ছে আবার চৌদ্দ বছর পর অতি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পুরনো প্রেমিক এবং স্বামীর মুখোমুখি বসে তার সঙ্গে কথা বলছে। বলছে অতি স্বচ্ছন্দে, কোথাও কোনও জড়তা নেই।

এ কী করে সম্ভব!

ওয়েটার সফট ড্রিংকস দিয়ে গেল।

আলতো করে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল মিলি। তারপর আচমকা বলল, তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ।

রুমি মৃদু হাসল। তাই নাকি!

হ্যাঁ। বেশ ফর্সা হয়েছ। আগের চে সুন্দর লাগছে। একটু গম্ভীর গম্ভীরও লাগছে। মনে হচ্ছে বেশ পার্সোনালিটি গ্রো করেছে। কিন্তু তুমি গোঁফ ফেলেছ কেন?

গোঁফটা পেকে গিয়েছিল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, বয়স হয়েছে তো!

কিন্তু তোমার চুল তেমন পাকেনি।

সত্যি চুলটা তেমন পাকেনি। চুলের চে গোঁফের বয়স পনের ষোল বছর কম তারপরও গোঁফটা আগে পেকে গেছে।

কথাটা শুনে হাসল মিলি। ভালই বলেছ।

রুমি তার গ্লাসে চুমুক দিল। তারপর তীক্ষ্ণচোখে মিলির চোখের দিকে তাকাল। মিলি, কেমন আছ তুমি?

একথায় মিলি যেন কেমন কেঁপে উঠল। মুখটা কেমন যেন বিষণ্ণ হল তার। কোনও রকমে সে বলল, আছি ভালই আছি। স্বামী সংসার বাচ্চাকাচ্চা, দিন চলে যাচ্ছে। কোথাও তেমন কোনও সমস্যা নেই।

তারপর গভীর করে রুমির চোখের দিকে তাকাল। তুমি? তুমি কেমন আছ?

যেমন তুমি রেখেছ।

আমি রাখার কে, বল! আমি কি তোমার কেউ?

এসব বলার জন্যই এতদিন পর আমি এবার দেশে ফিরেছি। তোমার মুখোমুখি হয়েছি। সাদিকে ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছি। তুমি এমন করেছিলে কেন, মিলি?

মিলি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সেই ওয়েটার। অর্ডার দেবেন?

এবার কথা বলল রুমি। আরও আধঘণ্টা পর।

ঠিক আছে।

ওয়েটার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা অন্যদিকে ঘোরাল মিলি। তোমাকে আমি প্রথম কবে দেখেছিলাম তোমার মনে আছে, রুমি?

রুমি একটু আনমনা হল। না। তোমারটা আমি কেমন করে বলব! তবে আমি তোমাকে প্রথম কবে দেখি সেকথা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

কবে বল তো?

আমি আর সাদি তখন পাঠশালায় পড়ি। আমাদের মুসলমানি হয়েছে। দুজনের একসঙ্গে। একটা দিন কোনও রকমে ঘরে শুয়ে থেকেছি আমরা। তারপর থেকেই বাইরে। মুসলমানি উপলক্ষে আমাদের দুজনকে ছোট্ট লুঙ্গি কিনে দেয়া হয়েছে। সেই লুঙ্গি কোমরে গিঁট দিয়ে পরিয়ে দিয়েছেন খালা। জায়গাটায় যাতে ঘষাটষা না লাগে এজন্য লুঙ্গিটা উঁচু করে ধরে রাখি আমরা দুজনে, পা ফাঁক করে সাবধানে হাঁটি। সে সময় ফুফা ফুফু তোমাদের নিয়ে এলেন আমাদের বাড়িতে। তুমি তখন এই এতটুকু। ফুফুর খুব ন্যাওটা ছিলে, সারাক্ষণ তার কোলে কোলে। কিন্তু দেখতে ছিলে পুতুলের মতো। সুযোগ পেলেই আমি তোমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

রুমির কথা শুনে আশ্চর্য এক ভাল লাগায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিলির মুখ। আর আমি তোমাকে প্রথম কবে দেখি, প্রথম কবে তোমাকে আমার ভাল লাগে জানো! হাসি আপার বিয়ের সময়। তখন তো বাড়িভর্তি লোক, এত হৈচৈ। সেই হৈচৈয়ের মধ্যে একদিন দুপুরের পর দেখি পুবের ঘরের টেবিলটায় বসে নিবিষ্টমনে স্কুলের লেখা লিখছ তুমি। দেখে কী যে ভাল লাগল আমার! বোধহয় ওই মুহূর্তেই আমি তোমার প্রেমে পড়লাম। তোমার কথা মনে পড়লে এখনও পর্যন্ত প্রথমেই আমি সেই দুপুর শেষের তোমাকে দেখতে পাই।

কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এমন করলে কেন, মিলি?

আশ্চর্য ব্যাপার, তখুনি আবার এল সেই ওয়েটার। আমাদের কিচেনে স্যার খাবার তৈরি করতে একটু সময় লাগে। এখন অর্ডার দিলে আধঘণ্টা লাগবে রেডি হতে।

রুমি খুবই বিরক্ত হল। তারপর মেনু দেখে দুমিনিটের মধ্যে অর্ডার দিয়ে দিল।

মিলি তখন উদাস, আনমনা হয়ে আছে। ওয়েটার চলে যেতেই রুমির মুখের দিকে তাকাল। আমরা দুজন ভেতরে ভেতরে দুজনকে পছন্দ করতে শুরু করেছি এটা প্রথম টের পেয়েছিল পুতুল আপার ছোটবোন বিনা। আমার ছোটখালার বিয়ে হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। সব আত্মীয় স্বজন এসেছে। তোমরাও এসেছ। আমি নানারকম ভাবে সুযোগ খুঁজছি তোমার সঙ্গে কথা বলার। ভালবাসি এই কথাটা বলব। কিন্তু বাড়িভর্তি লোক। কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছি না। বিনা কেমন করে যেন বুঝে গেল। বলল, দাঁড়া আমি ব্যবস্থা করছি। তারপর ছাদে আমাদের দেখা হল। তুমি গিয়ে আগেই দাঁড়িয়েছিলে।

বিনা আমাকে বলেছিল, তুমি যেতে বলেছ।

আর আমাকে বলেছে, যে তুমি যেতে বলেছ। মনে আছে, ভালবাসি এই কথাটা সেদিন আমি বলতে পারিনি।

আমিও পারিনি। আমার কেমন লজ্জা লাগছিল।

অবশ্য ভালবাসার কথা আমিই তোমাকে আগে বলেছি। কবে কোথায় বলেছি তোমার মনে আছে?

আছে।

কোথায় বল তো?

আকতার আপার বাসায়।

শুনে উচ্ছ্বসিত হল মিলি। ঠিক বলেছ। সেদিন যে আর একটা কাজ করেছিলে তুমি সেকথা মনে আছে। আমাকে তুমি প্রথম চুমু খেয়েছিলে।

মনে আছে। তুমি বলেছিলে তোমার ভাল লাগেনি।

মিথ্যে বলেছিলাম।

কেন?

জানি না। আমার একটু এরকম স্বভাব আছে। কত ভাল লাগার কথা আমি ঘুরিয়ে বলি কিংবা মুখ ফুটে কখনও বলিই না। কত মন্দ লাগার কথা স্পষ্ট বলে ফেলি। ভালমন্দ মিলিয়ে কত কথা মনের ভেতর চেপে রাখি। আমি যেন কেমন।

একটু উদাস হল মিলি। একটু আনমনা। রুমির মুখের দিকে তাকিয়েও যেন রুমিকে সে দেখতে পেল না। দেখতে পেল বহুদূর পেছনে ফেলে আসা একটি দিন। আকতার আপার বাসায় নিভৃত কিছুটা সময়। একদম ফাঁকা বাড়িতে সে আর রুমি। সেদিন রুমিকে সে প্রথম বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি।

রুমি বসে আছে ড্রয়িংরুমের সোফায়, মিলি দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। কথাটা বলেই মুখ নিচু করেছে সে।

কিন্তু এমন একটি কথা, শুনেও রুমি কোনও কথা বলল না। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তার সামনে। আলতো করে চিবুক তুলে ধরল তার। তারপর কী যে গভীর করে চুমু খেল। কতবার যে খেল আর অস্ফুট স্বরে বলল, আমিও তোমাকে ভালবাসি। পাগলের মতো ভালবাসি। এমন ভাল কেউ কাউকে বাসে না।

তারপরই যেন বাস্তবে ফিরে এল মিলি। দিশেহারা ভঙ্গিতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রুমির দিকে। দেখ, আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দেখ!

রুমি বুঝতে পারল না কেন হঠাৎ করে গা কাঁটা দিয়ে উঠল মিলির। কী হয়েছে! তবে তার খুব ইচ্ছে করল মিলির হাতটা ধরতে। কী ভেবে ধরল না। বলল, কেন হঠাৎ করে গা কাঁটা দিয়ে উঠল?

সেদিনের কথা ভেবে। সেই যে আকতার আপার বাসায় আমাকে তুমি প্রথম চুমু খেলে, মনে হল সেদিন নয় যেন আজই, এই মুহূর্তেই প্রথম আমাকে তুমি চুমু খেলে। আমি তোমাকে ভালবাসার কথা বললাম জীবনে প্রথম। আর এই সময়টাতেও নেই আমরা। অনেক অনেকগুলো বছর আগের সেই দিনটাতে ফিরে গেছি। তুমি আমাকে চুমু খাচ্ছ, জড়িয়ে ধরে আদর করছ আর ভেতরে ভেতরে অসম্ভব এক ভাল লাগায় যেন মরে যাচ্ছি আমি। এজন্যই বলেছিলাম আমার ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না। প্রথম প্রেমের সময়, গভীর ভাল লাগার সময় এমন করেই বলে কোনও কোনও মেয়ে। আমিও বলেছিলাম। আসলে তীব্র ভাল লাগার কথাই ঘুরিয়ে বলেছিলাম।

এ সময় ওয়েটার এসে খাবার রেখে গেল। টেবিল প্রায় ভরে গেল খাবারে। দুজনের কেউ ফিরেও তাকাল না। মিলি যেন সেই সোনালি দিন থেকে বলল, তারপর থেকে কতরাত আমি ঘুমোতে পারিনি। কতরাত তোমার কথা ভেবে কেটে গেছে আমার। কতরাত তোমার কথা ভেবে শরীরের ভেতর প্রচণ্ড ভাঙচোর হয়েছে। থেকে থেকে কাঁটা দিয়ে উঠেছে গা। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তোমাকে আমি বুঝতে দিইনি কিছু। ওই যে বললাম কত কী মনের ভেতর চেপে রাখি আমি। চেপে রাখতে পারি। সারাজীবনেও সেইসব অনুভব অনুভূতির কথা কাউকে বলব না, কেউ জানবে না।

রুমি আবার বলল, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে অমন করেছিলে কেন?

সেই সময়ের ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে মিলি বলল, এছাড়া তখন আমার কোনও উপায় ছিল না। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই, শুধু তোমাকে কিন্তু তোমাকে কেউ মেনে নিতে চাচ্ছে না। নানারকমের কথা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। ওদিকে তুমি তৈরি হচ্ছো আমেরিকায় যাওয়ার জন্য। কেমন করে করে ভিসা হয়ে গেল তোমার। তখন অন্যরকমের এক স্বপ্নের মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা দুজন। তুমি বললে আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর নিশ্চয় আমার মা বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়েতে আর অমত করবে না। আমেরিকায় থাকা পাত্রকে কে না পছন্দ করে! বছর দুতিনেকের মধ্যে সব গুছিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করতে আসবে। আমাদের জীবন কাটবে আমেরিকায়। কিন্তু আমি যেন কোথাও কোনও ভরসা পাচ্ছিলাম না। আমার মনটা যেন কেমন করছিল। যেন

বিশ্বাস হচ্ছিল না কোনও কিছু। এজন্যই বিয়ের কথাটা বললাম আমি। গোপনে বিয়ে করে রাখতে চাইলাম। কিন্তু তুমি একদম চাইছিলে না। নানারকমভাবে বুঝিয়েছিলে আমাকে, আমি কিছুতেই কিছু বুঝতে চাইনি। আকতার আপা এবং দুলাভাইকে ম্যানেজ করলাম। নিঃশব্দে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের?

রুমির কী রকম কান্না পাচ্ছিল। কথা বলতে গিয়ে গলা জড়িয়ে আসছিল। তবু কোনওরকমে সে বলল, কিন্তু তারপর, তারপর কী করলে তুমি?

মিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এও আসলে আমার মনের কারসাজি। আমি আমার মনকে ঠিক বুঝতে পারি না। তুমি চলে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম কী যে কষ্ট হতো আমার! তারপর অন্য একটা অনুভূতি হতে লাগল। আমি জানি একথা তুমি বিশ্বাস করবে না, পৃথিবীর কেউ বিশ্বাস করবে না। তবু এটা সত্য, তবু আমার জীবনে এটা ঘটেছিল। আমার একসময় মনে হতে লাগল তোমার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটেনি আমার জীবনে। বাস্তবে তুমি আমাকে কখনও স্পর্শ করনি, চুমু খাওনি। আমি তোমাকে মুখ ফুটে ভালবাসার কথা বলিনি, তুমিও বলনি কখনও। সবকিছু ঘটেছিল স্বপ্নে। স্বপ্নে আমি তোমাকে ভালবেসেছি, তুমি বেসেছ আমাকে। স্বপ্নে তুমি আমাকে চুমু খেয়েছ। স্বপ্নের ঘোরেই যেন ওভাবে বিয়ে হয়েছিল আমাদের। ব্যাপারটা একেবারেই অবাস্তব।

কেন এমন মনে হয়েছিল তোমার?

জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না। হয়তো তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্ন এবং বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল আমার জীবনে। কোনটা বাস্তব, কোনটা স্বপ্ন আলাদা করতে পারিনি আমি। তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পর আমার মনে হয়েছে বাস্তবে তুমি বলে আসলে কেউ নেই। তুমি ছিলে আমার স্বপ্নে, আমার কল্পনায়। তারপর মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের মতো জীবন হয়েছে আমারও। বিয়ে সংসার সন্তান। কিন্তু আমার স্বপ্নের অনেক গভীরে এখনও রয়ে গেছ তুমি। স্বপ্নে এখনও যখন সেইসব দিনে ফিরি আমি, আমার গা কাঁটা দেয়। কিশোরবেলার মতো তোমাকে নিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে ভাঙচোর হয়।

মিলির কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল রুমি। অপলক চোখে মিলির চোখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, কিন্তু বিয়ের কাগজপত্র সব আমার কাছে রয়ে গেছে। আইনের চোখে আমরা স্বামী স্ত্রী। এই অবস্থাটা শেষ হওয়া উচিত। আমরা দুজনেই না হয় দুজনের স্বপ্নে থেকে গেলাম কিন্তু বাস্তব আমাদের মেনে

চলা উচিত। আমার দিক থেকে গোপনে ব্যাপারটা আমি শেষ করে দিতে চাই। এজন্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি আমি, এতদিন পর দেশে ফিরে এসেছি।

হাত বাড়িয়ে রুমির একটা হাত ধরল মিলি। না, তুমি তা করো না। স্বপ্নের মতো বাস্তবেও একটা বন্ধন আমাদের থাক। কেউ জানবে না, শুধু আমরা দুজন জানব, যে যেখানেই থাকি আমরা দুজন আমাদেরই আছি। স্বপ্নে এবং গোপন বাস্তবে।

কিন্তু এ কেমন জীবন মিলি?

মিলি কোনও কথা বলল না। উদাস হয়ে রইল।

❑